কঙ্গোরিলা

চিরঞ্জীব সেন

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৬৪ সন
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ সারকুলার রোড
হাওড়া-৪
ব্লক
মডার্ন প্রসেস
কলেজ রো
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীপঙ্কজকুমার দোলুই
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫/৭ কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩।

স্নেহাস্পদ

ডাঃ ভবতোষ গুপ্তকে

—চিরঞ্জীব সেন

ভূমিকা

আফ্রিকার কোনো অংশ আজও নাকি অনাবিষ্কৃত নয় তবুও আফ্রিকাকে বলা হয় ডার্ক কন্টিনেন্ট। শুধু মাত্র আফ্রিকার কঙ্গো, বর্তমানে যার নাম জেয়ার সেই জেয়ারে যে বিশাল গভীর অরণ্য আছে সেই অরণ্যর জন্যেই আফ্রিকার এই বিশেষণ।

সেই গভীর অরণ্য যাকে রেন ফরেস্ট বলা হয় সেই রেন ফরেস্টের গভীরে যে কি আছে তা কি সকলে জানেন ?

প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ বর্গ মাইল-ব্যাপী এই বিশাল অরণ্যের অনেক অংশে আজও মানুষ প্রবেশ করতে পারে নি। প্রবেশ করে কেউ ফিরে আসে নি।

এই গভীর অরণ্যের ভেতরে আছে একটি অতি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ যার নাম জিঞ্জ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থ রিসোরসেস টেকনোলজি সারভিসেস-এর গবেষকরা খবর পায় যে ঐ প্রাচীন শহরে এমন এক বিশেষ হীরে পাওয়া যায় যা উন্নত ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রে ব্যবহৃত হয় এবং যা অতি দ্রুতগতি রকেটের এঞ্জিন তৈরি করতে অপরিহার্য। সেই হীরে পেলে আলোর গতিসম্পন্ন এমন রকেট তৈরি করা যাবে যার কাছে অ্যাটম বোমা পুরনো হয়ে যাবে।

একদল অভিযাত্রী সেই বিরল হীরের সন্ধানে কঙ্গোর সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরে যাবে। তাদের দুঃসাহসিক সেই অভিযান হলো কঙ্গোরিলার কাহিনী।

এই বই লেখবার সময় আমি মাইকেল ক্রিচটন লিখিত 'কঙ্গো', হ্যালেট-এর 'কঙ্গো কিটাবু', রাইডার হ্যাগার্ডের 'অ্যালান কোয়াটারমেন', ব্যালানটাইনের 'গোরিলা হান্টারস' এবং কয়েকটি পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি। বিশ্বভারতী ও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ হিমাংশু সরকারের কাছ থেকেও আমি প্রচুর সাহায্য পেয়েছি। এঁদের সকলের কাছে আমি ঋণ স্বীকার করছি।

—চিরঞ্জীব সেন

জেয়ার নামে সেই দেশের সেই বিখ্যাত রেন ফরেস্ট। জেয়ার নাম আজ আর কারও অপরিচিত নয়। আগে নাম ছিল কঙ্গো, স্বাধীন হবার পর নতুন নাম হয়েছে জেয়ার। জেয়ারের সেই রেন ফরেস্টে সবে ভোর হচ্ছে, গাছের পাতায় শিশির জমেছে, টুপটাপ করে বৃষ্টির ফোঁটার মতো শিশির-বিন্দু নিচের পাতার ওপর পড়ছে। নিচের পাতা থেকে আরও নিচে। মাটি ভিজে, অরণ্য ভিজে, আকাশও বুঝি ভিজে, কুয়াসা ফিকে হলেও দৃষ্টি বেশি দূর চলে না।

অরণ্য এখনও জেগে ওঠে নি। সবে দু একটা পোকার কিচকিচ বা কোনো নাম না জানা পাখির টুকি টুকি টুকি টুকি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

তারপর এক সময়ে অরণ্য জেগে উঠল, সূর্যও উঠল কিন্তু সেই রেন ফরেস্ট এত গভীর যে তাঁবুর বাইরে বসে জ্যান ক্রুগার বুঝতেই পারল না সূর্য কতখানি উঠেছে।

চল্লিশ ফুট ডায়ামেটার আর দুশো ফুট হাইট এমন অসংখ্য গাছ গা ঘেঁসাঘেঁসি করে দাঁড়িয়ে আছে। গাছগুলোকে জড়িয়ে কত রকম লতা, জড়িয়ে আছে কত রকম পরজীবি গাছ, গুঁড়িতে জমাট বাঁধা মাশরুম আর নিচে জমিতে ফার্ন।

সব গাছ সবুজ নয়, সব গাছ ফলে ফুলে ভর্তি নয়, সব গাছ নির্দোষ নয়। কত গাছ আছে যার পাতা ছুঁলেই গা চুলকোবে, ফল খেলে মৃত্যু, ফুলের গন্ধ শুঁকলে জ্ঞান হবে লুপ্ত। সে জ্ঞান আর ফিরে নাও আসতে পারে। এমন লতাও আছে যে লতা সাপের মতো পায়ে জড়িয়ে ধরে। জট ছাড়াতে যেয়ে লতার কাঁটায় হাত রক্তাক্ত হয়।

এ এক অন্য অরণ্য-জগত, 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক নয়, নয় আর্ণস্ট হেমিংওয়ের গ্রীন হিলস্ অফ আফ্রিকা।

সূর্য ওপরে ওঠে, অরণ্যের অন্ধকার পাতলা হয় তবে আলো স্পষ্ট হয় না,

কুয়াসাও দূর হয় না।

এই অরণ্যেই বিশাল একটা গাছের নিচে খানিকটা জায়গা সাফ করে নাইলনের আটটা তাঁবু ফেলা হয়েছে। সাতটা তাঁবুর রং ব্রাইট অরেঞ্জ, অষ্টম তাঁবুর রং ব্লু, এই তাঁবুতে রান্নাবান্না হয়, রসদ জমা থাকে।

এই অরণ্যে আনা হয়েছে স্যাটেলাইট মারফত বার্তা ও ছবি পাঠাবার অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম।

ক্যাম্পে যা ঘটছে তার বার্তা ও ছবি সঙ্গে সঙ্গে দশ হাজার মাইল দূরে অ্যামেরিকায় ইউস্টনে হেডকোয়ার্টারে বিশেষ পর্দায় প্রতিফলিত হচ্ছে।

জ্যান ক্রুগার রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছিল। রাইফেলটা নামিয়ে রেখে একবার আড়মোড়া ভাঙল। একটু তফাতে স্থানীয় একজন গার্ড একটা পাথরের ওপর বসে রয়েছে। তার নাম মিস্‌লু। মিস্‌লু আড়-চোখে জ্যান ক্রুগারকে একবার দেখে নিল।

কাছেই রয়েছে ট্রান্সমিটিং ইকুইপমেন্ট, একটা সিলভার ডিশ অ্যানটেনা, ব্ল্যাক ট্রান্সমিটার বক্স, সাপের মতো কিলবিলে কো-অ্যাকসিয়াল কেবল্ যা পোর্টেবল ভিডিও ক্যামেরার সঙ্গে যুক্ত, ক্যামেরাটা বসানো আছে ত্রিপদ স্ট্যাণ্ডের ওপর।

কার্যকারিতা অক্ষুণ্ণ রেখে এইসব অতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি শুষ্ক রাখা এক মহা-সমস্যা। এইজন্যে সর্বদা সজাগ থাকতে হয়।

কঙ্গোর রেন ফরেস্টে এই অভিযানের নেতার নাম জ্যান ক্রুগার। এই লাইনে ক্রুগার মোটেই অনভিজ্ঞ নয়। এর আগে সে আরও কয়েকটি অভিযানে অংশ নিয়েছে বা নেতৃত্ব দিয়েছে যদিও প্রতিটি অভিযানের চরিত্র ভিন্ন, যথা—কোনো অয়েল কোম্পানির জন্য পৃথিবীর দুর্গম স্থানে তৈলানুসন্ধান, কোথাও কোনো মানচিত্র সমীক্ষা কিংবা অরণ্যে এমন গাছের সন্ধান করা যা থেকে সেগুনের তুল্য কাঠ পাওয়া যায়। কিংবা ভূগর্ভে বিরল খনিজের সন্ধান, পাহাড় পর্বতে অভিযান।

স্থানীয় রীতিনীতি, ভাষা ও আবহাওয়া সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান আছে, অভিযাত্রিপ্রেরক দল এমন ব্যক্তিই পছন্দ করে। তা ক্রুগারের এই রকম

নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। আফ্রিকার, কয়েকটি কথ্য ভাষার সঙ্গে সে পরিচিত। অভিযানে মোটবাহী ব্যক্তিদের সে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারে। কঙ্গোতে সে পূর্বে আরও কয়েকটি অভিযানে এলেও ভিরুঙ্গাতে সে আগে কখনও আসে নি।

কঙ্গো বা জেয়ারের ভিরুঙ্গা অঞ্চলে অ্যামেরিকানরা কেন এই অভিযান পাঠাচ্ছে তা ক্রগার জানে না, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাকে আপাতত পরিষ্কার করে কিছু বলা হয় নি। রেন ফরেস্টের উত্তর পূর্ব দিকে ভিরুঙ্গা। খনিজ সম্পদে কঙ্গো ধনী তার মধ্যে কোবল্ট এবং শিল্পে ব্যবহৃত হীরে কঙ্গোতেই সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। তামাও পাওয়া যায় প্রচুর। তাছাড়া সোনা, টিন, জিংক, টাংস্টেন এবং ইউরেনিয়মও পাওয়া যায়। তবে এই সব খনিজ পদার্থ ভিরুঙ্গাতে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় সাবাই এবং কাসাই জেলায়।

অ্যামেরিকান ভূতাত্ত্বিকরা এখানে কিসের সন্ধানে এসেছে ক্রগার তা পরে অনুমান করতে পেরেছিলো। তারা এসেছে সোনার সন্ধানে নয়, হীরেব সন্ধানে, অলংকারে ব্যবহৃত হীরের জন্যে নয়, শিল্পে এবং বর্তমানে কয়েকটি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিতে যে হীরে এখনও অপরিহার্য সেইজন্যে।

টাইপ টু-বি নামে একরকম হীরে আছে। সেই হীরের নমুনা পাওয়া গেলেই অ্যামেরিকানরা সেটি নানাভাবে পরখ করবে। ক্রগার বিজ্ঞানী নয়। ওদের সব কথাবার্তা বুঝতে পারে না, ডাই-ইলেকট্রিক গ্যাপ কি, ল্যাটিস আয়ন ব্যাপারটা কি, রেস্টিভিটি কাকে বলে এসব সে জানে না। জানবার দরকার কি? তাকে যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে, অভিযাত্রী দলটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করে নিয়ে যাওয়া, বিপদ থেকে রক্ষা করা এবং সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা, এগুলি করতে পারলেই সে নিজেকে ধন্য মনে করবে। সে এইটুকু বুঝতে পেরেছে যে টাইপ টু-বি হীরেতে যে বৈদ্যুতিক সম্পদ নিহিত আছে সেই বিষয়েই বিজ্ঞানীরা কৌতূহলী। এই হীরে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের কাছে অচল।

দশ দিন পার হয়ে গেল তারা রেন ফরেস্টে এসেছে। তারা ক্রমশঃ

পাহাড়ের পশ্চিম গা বেয়ে আরও ওপরে উঠছে। ওদিকে আছে পর পর কয়েকটি ভলক্যানো। সবকটা প্রায় নিবে গেছে কিন্তু দু একটা এখনও সক্রিয় আছে। তারা মাঝে গরম লাভা বমি করে, মাথায় জ্বালায় অগ্নি-শিখা, ধোঁয়া আর পাতলা ছাই ছড়িয়ে দেয়। সারা বনাঞ্চলে, তখন পশু পাখিরাও ভয়ে পালায়। অভিযাত্রী দল ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলো কিন্তু হঠাৎ একদিন ভারবাহী পোটাররা সোজাসুজি বলল তারা আর যাবে না ; সামনে আছে কানিয়ামা গুফা যার অর্থ নর-কংকালের রাজ্য। ওখানে গেলে তাদের কেউ আর ফিরে আসে না। তাদের হাড়গোড় বিশেষ করে তাদেব মাথার খুলি ভেঙে গুড়ো করে দেওয়া হবে। কথা বলতে বলতে তারা বার বার মাথা নাড়ে আর মাথা ও চোয়ালে হাত বুলোয়। তারা বলে এটা কুসংস্কার নয়, বাস্তব ঘটনা।

তারা বলে এধারে কোনো মানুষ বাস করে না এমন কি পিগমিও নয়। এখানে আমরা এবং কেউ যাই না। এ বড় ভাষণ ভয়াল ও সাংঘাতক জায়গা। না বওনা মুকুবওয়া আমরা আর যাব না। ওধারে 'দওয়া' আছে তারাই মানুষের হাড় চূণ বিচূণ করে, কালো সাদার বিচার করে না।

দওয়ার কথা শুনতে শুনতে ক্রুগার বিরক্ত হয়ে গেছে। দওয়া নাকি সর্বত্র আছে। গাছে পাহাড়ে, নদীতে এমন কি ঝড় বৃষ্টিতেও। চৈনিকরা যেমন বলে চি নামে এক অদৃশ্য মহাশক্তি সব কিছুতেই আছে।

আফ্রিকায় সবত্র তবে বিশেষ করে কঙ্গোর এই অঞ্চলে দওয়া অতি প্রবল ; কালো মানুষদের তাই দৃঢ় বিশ্বাস।

ভারবাহীদের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে একটা পুরো দিন চলে গেল। ক্রুগার বলল তাদের পারিশ্রমিক দ্বিগুণ করে দেবে এবং অভিযান থেকে ফিরে এলে তাদের প্রত্যেককে একটা করে রাইফেল উপহার দেবে।

পারিশ্রমিকের রেট বাড়িয়ে নেবার জন্যে ভারবাহীরা মাঝে মাঝে এই-রকম কৌশল অবলম্বন করে কিন্তু ক্রুগার এদের অনেক দিন থেকে চরিয়ে

আসছে। এদের চরিত্র জানে। বুঝল এটা ধাপ্পা নয়। সত্যিই কিছু ভয়াবহ ব্যাপার আছে। আসবার সময় পথে দু তিন জায়গায় কংকাল দেখা গিয়েছিল, পোর্টাররা মাথা থেকে মাল নামিয়ে বলেছিলো তারা আর যাবে না। কিছু হাড় নিজের হাতে তুলে নিয়ে ক্রুগার যখন বোঝালো এগুলি নরকংকাল নয় বাঁদরের হাড় তখন তারা যেতে রাজি হয়।
ক্রুগার নিজেও বুঝতে পারে না দওয়া বলে যদি কিছু থাকে ত সে তাদের হাড়গোড় ভেঙে দেবে কেন? তবে আফ্রিকা এক গভীর রহস্যের দেশ এবং কয়েকটি রহস্যের সেও সম্মুখীন হয়েছিলো।
জিম্বাবোয়ে, ব্রোকেন হিল এবং মনিলিউই অঞ্চলে তাকে বড় বড় পাথর দেখিয়ে বলা হয়েছিল এখানে একদা সমৃদ্ধ নগরী ছিল। পাথরের আকার যদিও অন্য ধরনের তথাপি ক্রুগার বিশ্বাস করতে চায় নি। সত্যিই পাথরগুলি কোনো নগরীর ধ্বংসাবশেষ কিনা তা বিজ্ঞানীরাই বলতে পারে তবে বিংশ শতাব্দীর কোনো বিজ্ঞানী এই সব পাথর নিয়ে মাথা ঘামায় নি।
পোর্টাররা শেষ পর্যন্ত যেতে রাজি হয়। এরা কানিয়ামাগুফাই প্রান্তে পৌঁছে তাঁবু ফেলে। রাত্রি যত এগিয়ে আসে পোর্টাররা তত চঞ্চল হয়ে ওঠে। দওয়া এই এলো বলে তাদের আর নিস্তার নেই। ক্রুগার এবং অ্যামেরিকান বিজ্ঞানীরা তাদের শান্ত করবার চেষ্টা করে।
সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসী পোর্টার মিসুলু এবং সে নিজে রাইফেল হাতে পাহারা দিতে থাকে, আশ্বাস দেয় আরও কয়েকজন গার্ড সে মোতায়েন করবে।
প্রথম রাত্রি নির্বিঘ্নে শেষ হয়ে আসছে। এখনও পর্যন্ত কোনো ঘটনাই ঘটল না তবে রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে খসখস শব্দ শোনা গিয়েছিল। কোনো পশু নড়াচড়ার আওয়াজ। রাত্রে জঙ্গলে বাঘ শ্বাসকষ্টে ভোগে। তাদেরও আওয়াজ হতে পারে।
তখনও ভোর হয় নি। ভোর হলেও জঙ্গল এখনও অনেকক্ষণ গভীর অন্ধকারে থাকবে। ট্রান্সমিটার ও রিসিভিং যন্ত্র সরব হয়ে উঠল, একটা যন্ত্র

বিপ্ বিপ্ আওয়াজ করতে লাগলো, আলোর সংকেত জ্বলে উঠলো। ক্রুগার সঙ্গে সঙ্গে হেড জিওলজিস্ট ড্রিসকলকে ডেকে দিল। ড্রিসকল অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো না কারণ ক্রুগার লক্ষ্য করেছে টিভি-এর অ্যামেরিকান রিপোর্টারদের মতো এই জিওলজিস্টরা একটু সাজগোজ করে আসে তারপর ওরা বার্তা শুনতে ও পাঠাতে থাকে।

ক্রুগার নিজের আসনে এসে বসল। মাথার ওপর কোথায় কোনো গাছের উচু ডালে বসে কলোবাস মংকিগুলো কিচকিচ করছে। এ ডাল থেকে ও ডালে লাফালাফি করছে। ওরা সকালে এমন করে। ওদের এই আওয়াজ শুনে ক্রুগার বুঝতে পারে সূর্য ডুবেছে, সকাল হচ্ছে।

ক্রুগার চুপ করে বসে বাঁদরদের কিচিমিচি শুনছে। হঠাৎ তার বুকে কোমল কি একটা জিনিস ছিটকে এসে পড়ল। মারবেল গুলির সাইজের কি যেন একটা। ক্রুগার সেটা তুলে নিল, বাঁদরগুলো গাছ থেকে এই ক্ষুদে ফলগুলো তুলে ছুঁড়ে মারছে। আরে এটা তো কোনো ফল নয়। এ তো দেখছি চোখ। হাত থেকে পিছলে যাচ্ছে, এখনও ওটার সঙ্গে অপ-টিক নার্ভের খানিকটা লেগে রয়েছে। মানুষের চোখ বলে মনে হচ্ছে।

ক্রুগার বন্দুকটা হাতে তুলে নিল। মিস্লুলু যেখানে বসে ছিল সেই দিকে চাইল। মিস্লুলু সেখানে নেই। ক্রুগার সেইদিকে এগিয়ে গেল। সেখানে যেয়ে যা দেখল তাতে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারা অঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল।

ক্রুগার আফ্রিকার গহন অরণ্যে অনেক ঘুরেছে। অনেক কিছু দেখেছে কিন্তু এমন নিষ্ঠুর ও বীভৎস দৃশ্য সে কখনও দেখে নি।

সে দেখল মিস্লুলু পাথরের আড়ালে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মাথা ও মুখ ব্যতীত সারা অঙ্গ নিখুঁত কিন্তু মাথাটা কে যেন ভাইস মেসিনের মধ্যে ঢুকিয়ে চাপ দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। মাথাটা যেন নরম কাঁচের, হাত দিয়ে চাপ দিলে যেমন ভেঙে যায় তেমনি মিস্লুলুর মাথাটা ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। মুখটা হাঁ হয়ে গেছে, দাঁতগুলো ভেঙে গেছে। একটা চোখ যেখানে ছিল সেখানে রক্ত। সারা মাথা ও মুখে চাপ চাপ রক্তে ভর্তি।

মিসুলুর ঐ চোখটাই ক্রগারের বুকে ছিটকে পড়েছিল। বাঁদরদের কিচি-মিচি তখন থেমে গেছে। ক্রগার ভাবছে তাহলে ত পোর্টাররা সত্য কথাই বলেছিল, ওধারে দওয়া থাকে, দওয়া মানুষের মাথা গুঁড়িয়ে দেয়।
কিন্তু বাঁদরগুলোর কিচিমিচি আওয়াজ থেমে গেল কেন? সমস্ত বনটাই যেন নিস্তব্ধ শুধু একটা হিস হিস শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিসের শব্দ? কে যেন তার দিকে এগিয়ে আসছে। ক্রগারের বুক ঢিব ঢিব করতে লাগল। অন্ধকার ভেদ করে একটা বিরাট ছায়া তার দিকে এগিয়ে আসছে। অত বড় সাহসী ক্রগারও ভয় পেয়েছে। সে পিছন ফিরে পালাবার জন্য যেই পা বাড়িয়েছে অমনি ঘটনাটা ঘটে গেল। গাছের ওপরে বাঁদরগুলো আবার কিচমিচ করতে লাগল।

আফ্রিকার এই ঘটনাস্থল থেকে দশ হাজার মাইল দূরে ইউস্টন শহরে আর্থ রিসোরসেস টেকনোলজি সারভিসেস ইনক্-এর হেড অফিস, সং-ক্ষেপে আরিটেসা। এই আরিটেসাই আফ্রিকার রেন ফরেস্টে টাইপ বি-টু হীরের সন্ধানে ঐ অভিযাত্রী দলটি পাঠিয়েছিল।
অফিসটা বিরাট তার মধ্যে কয়েকটা ঘর কমপিউটার ও নানারকম যন্ত্র ও সরঞ্জামে ভর্তি। মহাকাশ থেকে উপগ্রহ নানারকন সংকেত ও ছবি পাঠায় উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট মারফত। সেই সব শব্দ সংকেত ও ছবি গ্রহণের জন্য যেসব যন্ত্র ব্যবহৃত হয় সেইসব যন্ত্রও এই ঘরগুলিতে আছে। এগুলি বিশেষ ধরনের টেলিভিসন। এই রকম টেলিভিসন মার-ফত পৃথিবীতে বসে বহু ব্যক্তি চাঁদে মানুষের অবতরণ দৃশ্য তাদের নিজস্ব টিভি সেটে দেখেছিল।
অফিসের একটা জানালাবিহীন শীতল ঘরে এক কাপ গরম কফি নিয়ে বিশেষ একটি যন্ত্রের পর্দায় ডঃ ক্যারেন রস ছবি দেখছে। সিনেমার ছবি নয় অবশ্যই। আফ্রিকার সেই অভিযাত্রী দলের সঙ্গে যে স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা আছে, সেই ক্যামেরা যে ছবি পাঠাচ্ছে সেই ছবি ডঃ ক্যারেন

রস একদৃষ্টে দেখছে। সেইসব ছবি সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও টেপ হয়ে যাচ্ছে। পরে এই ভিডিও টেপ চালিয়ে ছবিগুলো আবার দেখা যাবে।

ডঃ ক্যারেন রস মহিলা বিজ্ঞানী। আরিটেসা প্রেরিত এই কঙ্গো প্রজেক্টের সে সুপারভাইজার। ক্যারেনের বয়স বেশি নয়, এখনও তাকে যুবতী বলা চলে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ও অত্যন্ত কর্মঠ।

যদিও ঘরে কোনো ঘড়ি নেই এবং এখন দিন না রাত্রি তাও ঘরে বসে বলবার উপায় নেই তবুও এখন রাত্রি সওয়া দশটা। ক্যারেন আফ্রিকা থেকে প্রেরিত ছবির আশায় যন্ত্রের পর্দার দিকে চেয়ে বসে আছে।

সব ক'টা ঘরই এই রকম, ভেতরে বসে দিনরাত্রি বোঝার উপায় নেই তবে এমন যন্ত্রও ঘরে বসানো আছে যার দ্বারা নিখুঁত সময় জানা যায়। সব ঘরে সারা দিন রাত্রি থাকে বলে রাউণ্ড দি ক্লক কাজ চলছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আরিটেসা যে সব দল পাঠিয়েছে সেখান থেকে সরাসরি খবর ও ছবি আসছে এবং বার্তা পাঠানো হচ্ছে। ঘরে কতরকম যন্ত্র। কত রকম আলো।

ডঃ ক্যারেন যে ঘরে বসে আছে সেই ঘরে একটা ডিজিটাল ক্লক আছে সেই ঘড়ি কঙ্গোর সময় নির্দেশ করছে। কঙ্গোতে তখন সকাল সওয়া ছটা।

আরিটেসা-এর চিফ হলো ডঃ আর বি ট্রেভিস। এ নাম আমাদের দেশেও অপরিচিত নয়। দুর্দান্ত এক বিজ্ঞানী। ক্যারেন এই অভিযানের সঙ্গে কঙ্গো যেতে চেয়েছিল কিন্তু ডঃ ট্রেভিস রাজি হয় নি। ক্যারেনের অবশ্য যোগ্যতা আছে। চোখা বিজ্ঞানী হিসেবে সে নাম কিনেছে। যদিও সে ছ ফুট লম্বা তবুও কঙ্গোর দুর্গম অঞ্চলে ডঃ ট্রেভিস তাঁকে পাঠাতে রাজি হন নি তবে ইউস্টন থেকে দলটির তদারক ও নির্দেশ দেবার ভার তিনি দিয়েছিলেন। ক্যারেনও এই কাজ নিয়ে রাতদিন ডুবেছিল।

ছটা বেজে বাইশ মিনিটে কঙ্গো থেকে আবার ছবি আসা আরম্ভ হলো। প্রথমে একটা অস্পষ্ট ধূসরতা। তারপর ছবি ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে লাগলো। তারা পর্দায় দুটো তাঁবু দেখতে পেল আর দেখতে পেল নিবে যাওয়া

খানিকটা আগুন, কিছু কুয়াসা। কোনো কর্মচাঞ্চল্যের লক্ষণ নেই, এক-টাও মানুষ দেখা যাচ্ছে না।
ঘরে কয়েকজন টেকনিসিয়ান ছিল। একজন হেসে বলল, ওরা এখনও ঘুমোচ্ছে।

ক্যারেন বলল, চুপ কর। আমার মনে হচ্ছে সিরিয়াস কিছু ঘটেছে, কঙ্গোর ফিল্ড ক্যামেরাকে ধর তারপর ক্যামেরা প্যান কর।
ক্যারেনের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে টেকনিসিয়ানরা চুপ করে গেল। তারা তৎক্ষণাৎ ক্যারেনের নির্দেশমতো কাজ করতে লাগলো। যন্ত্রপাতিগুলি ঠিকঠাক করার পর যা দেখা গেল তা দেখে সকলে চমকে উঠলো; এ কি ভয়াবহ দৃশ্য!
প্রথম ছবিতে তাঁবু দুটো অস্পষ্ট ছিল। এখন দেখা গেল সবকটা তাঁবুই ধ্বংস হয়েছে। কে বা কারা সেগুলো ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে, জিনিস-পত্র তছনছ, যেন একটা সাইক্লোন হয়ে গেছে, যন্ত্রপাতিগুলো কাদায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। একটা তাঁবু পুড়ছে, কালো ধোঁয়া উঠছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটা লাস পড়ে রয়েছে।
জিসাস! একজন টেকনিসিয়ান দীর্ঘশ্বাস ফেলল।
ক্যারেন নতুন একটা নির্দেশ দিল। এবার তারা তাঁবুর চারদিকের জঙ্গল দেখতে পেল কিন্তু কোথাও কোনো প্রাণের সাড়া নেই।
ক্যারেন অন্য নির্দেশ দিল। এবার দেখা গেল পোর্টেবল অ্যান্টেনার একটা অংশ আর ট্রান্সমিটারের র‍্যাক বক্স মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে আর পাশেই একজন জিওলজিস্টের লাস পড়ে রয়েছে।
জিসাস! এ তো রজার্স।
ক্যারেন নির্দেশ দিল, জুম আর টি-লক।
রজার্সের মুখটা ভাল করে দেখা গেল। তার মাথাটা কেউ গুঁড়িয়ে দিয়েছে, চোখ আর নাক দিয়ে তখনও রক্ত পড়ছে।
আর একজন টেকনিসিয়ান প্রশ্ন করল, এমন কাণ্ড কে করল?
সেই মুহূর্তে একটা বেশ বড় মানুষের ছায়া পর্দায় ভেসে উঠল, স্পষ্ট নয়।

একটু খোঁড়াচ্ছে, মনে হলো যেন জখম হয়েছে।
ক্যারেন বলল, কে ওটা ? মানুষ বলে ত মনে হচ্ছে না, তাহলে ওটা কি হতে পারে ? হিস্ হিস্ একটা শব্দও শোনা যাচ্ছে। কিসের শব্দ ?
কয়েকটা বোতাম টিপতে বলল ক্যারেন। শব্দ স্পষ্ট হলেও চেনা গেল না কিসের শব্দ। মানুষের বা যারই হোক ছায়া তখন ক্যামেরার লেন্সের সামনে এসেছে। তার মুখ লেন্সের এত কাছে যে তা ফোকাসের পাল্লায় আসে না।
কোনো আফ্রিকান ?
ওখানে কোনো মানুষ বাস করে না। ক্যারেন বলল।
জীবটা তখনও লেন্সের সামনে। ক্যারেন বলল, ডাইঅপটার সাহায্যে ফোকাস কর। নির্দেশ দিতে দেরি হয়েছিল। সেই অজানা জীব ক্যামেরাটাকেই ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। ইউস্টন কেন্দ্রে আর কিছুই দেখা গেল না তবে শেষ পর্যন্ত তারা মস্ত বড় একটা মাথা আর লোমশ একটা হাত দেখতে পেয়েছিলো।

আক্রমণকারী যেই হোক তারা সবকিছু বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেছে।

সালের জুন মাসে আরিটেসা-এর ফিল্ড টিম বলিভিয়াতে ইউরেনিয়ম, পাকিস্তানে তামা, কাশ্মীরে কৃষিক্ষেত্রের ফসল, আইসল্যাণ্ডে গ্লেসিয়ার, ম্যালয়েশিয়াতে টিম্বার এবং কঙ্গোতে ডায়মণ্ড খুঁজে বেড়াচ্ছিল তথ্য অনুসন্ধান করছিল বা সমীক্ষা করছিল। এসব কাজে ওদের বিভিন্ন দল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত থাকে, এটা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।
তবে দেশের রাজনীতিক পরিস্থিতির জন্যে আরিটেসাকে বিপদ বা অসুবিধায় পড়তে হয়। রাজনীতিক পরিস্থিতি ব্যতীত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও তাদের বিপদে ফেলে। আরিটেসার ভাষায় বিপদের প্রথম সংকেতকে বলা হয় ইণ্টারফিয়ারেন্স সিগনেচার বা শুধু সিগনেচার। বেশির

ভাগ ইন্টারফিয়ারেন্স সিগনেচার ঘটে রাজনীতিক পরিস্থিতির জন্যে। ১৯৭৭ সালে এই কারণে বোর্নিয়ো থেকে পুরো একটা দলকেই বিমানে করে তুলে আনতে হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে নাইজিরিয়া থেকেও দ্রুত সরে আসতে হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে গুয়াটেমালায় ভূমিকম্পের ফলে কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই ফিরে আসতে হয়েছিল।

১৯৭৯ সালের জুন মাসের ১৩ তারিখে কঙ্গোর রেনফরেস্টে যে ঘটনা ঘটল আরিটেসা-এর চিফ আর বি ট্রেভিসের মতে এইটে হলো সবচেয়ে শোচনীয় ইন্টারফিয়ারেন্স সিগনেচার। সব সিগনেচারের মূল কারণ এতাবৎকাল জানা গেছে কিন্তু কঙ্গোর মূল কোনো কারণই কিন্তু জানা গেল না। এইটুকু জানা গেছে যে অজানা এক শক্তি মাত্র ছ মিনিটের মধ্যে তাদের তাঁবু সাজসরঞ্জাম সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে এবং পোর্টারসহ আটজন বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছে।

গভীর রাত্রে ট্রেভিসকে যখন তার শয়নকক্ষ থেকে ডেকে আনা হলো তখন সব শুনে তো সে হতভম্ব।

ট্রেভিসেব আটচল্লিশ বছর বয়স হয়েছে, মোটাসোটা মজবুত চেহারা। ট্রেভিস আসলে একজন এঞ্জিনিয়ার। প্রথমে রেডিও করপোরেশন অফ অ্যামেরিকা অর্থাৎ আরসিএ এবং পরে রকওয়েল প্রতিষ্ঠানে স্যাটেলাইট নির্মাণে নিযুক্ত ছিল।

নানারকম টেকনোলজিক্যাল সমস্যার সমাধান করে ট্রেভিস খ্যাতি অর্জন করেছে তাছাড়া তার মাথা খুব ঠাণ্ডা, উত্তেজিত হয় না, লোকের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে পারে।

আরিটেসা-এর ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটে নি। অভিযান ব্যর্থ এবং তার শিক্ষণপ্রাপ্ত আটজন বিজ্ঞানী মৃত, বহুমূল্য সাজসরঞ্জাম তছনছ। জনসাধারণ প্রশ্ন করলে সে কি জবাব দেবে? এমন ঘটনা কি করে ঘটলো? সে কী জবাব দেবে?

ট্রেভিস সকলকে বলল, কঙ্গো অভিযানের গোড়া থেকে যত ভিডিও টেপ আছে সব বার করে পরীক্ষা করে দেখ কোনো সূত্র পাও কি না।

কাজ সহজ নয়। এ কাজ অতি পলকা, তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। গভীর সমুদ্রে নেমে ডুবুরি হারানো বস্তু খুঁজে বেড়ায়, এ কাজ তার চেয়ে দুরূহ। একটু অসতর্ক হলে মূল্যবান তথ্য চিরতরে হারিয়ে যাবে। যাই হোক চিফের নির্দেশে বিভিন্ন টেকনিসিয়ানকে কাজ ভাগ করে দেওয়া হলো। একদল পরীক্ষা করবে প্রাপ্ত বার্তা, অপব দল পরীক্ষা কববে প্রাপ্ত ছবি।

ক্যারেন কিন্তু আগেই কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। সে একটি দুরূহ কাজের ভার নিয়েছে। কমপিউটারেব যে কাজ সে আরম্ভ করলো তাব একটা আলাদা নামও আছে, 'ওয়াশ সাইকেল'।

কঙ্গোরেন ফরেস্টের ক্যামেরার সামনে সর্বশেষ যে মুখ দেখা গিয়েছিল সে মুখ কার? সনাক্ত করতে পারলে বহস্য ভেদ হবে। সেই মুখ আরও স্পষ্ট করে দেখা যায় কি না সেই চেষ্টাই করতে লাগলো ক্যারেন এবং কঠোর পরিশ্রমের পর অবশেষে সাফল্য।

মুখখানা কোনো মানুষের নয়, বাঘেরও নয় কারণ ঐ অরণ্যে বাঘ নেই। মুখখানা হল একটি পুরুষ গোরিলাব।

ওদিকে আর একজন বিজ্ঞানী সেই হিস্ হিস্ শব্দের উৎস অনুসন্ধান করছিল। এই বিজ্ঞানীও কমপিউটারের সাহায্য নিয়েছিল। কঠোর পরিশ্রমের পর বিজ্ঞানী বলল, কমপিউটার বলছে ঐ হিস্ হিস্ শব্দ মানুষের নিঃশ্বাস গ্রহণের এবং সে শব্দ অন্ততঃ চারজন মানুষের।

ট্রেভিস যখন এই খবরটা ক্যারেনকে দিল তখন ক্যারেন বলল, হতেই পারে না, কমপিউটর ভুল করেছে। ঐ হিস্ হিস্ শব্দ মানুষের নয়, গোরিলার। আমি সেই মুখ সনাক্ত করেছি, স্পষ্ট ছবি পাওয়া গেছে। আমি বলি কি ওখানে এখনি আবার একটা অভিযাত্রী দল পাঠানো হোক এবং সে দল পরিচালনা করব আমি।

তুমি যাবে? এ প্রশ্ন উঠতেই পারে না। তাছাড়া তুমি বলছ ওটা গোরিলা, গোরিলা এমন ব্যবহার করে না। যেকটা মানুষ মরেছে সব কটারই মাথা চূর্ণ। গোরিলা কি সব মানুষকে ঐ ভাবে হত্যা করে? অসম্ভব।

সেই রহস্যই তো আমি ভেদ করবার জন্যে সেখানে যত শীঘ্র সম্ভব তাড়াতাড়ি যেতে চাই এবং যাবই।

ট্রেভিসেরও মনে মনে ইচ্ছে কঙ্গোতে আর একটা অভিযাত্রী দল অবিলম্বে পাঠানো হোক তবে যে ঘটনাটা ঘটে গেছে সেটা যেন গোপন রাখা হয়, কিছুতেই ফাঁস না হয়। ট্রেভিস ঘরে ফেরার আগে কঠোর আদেশ জারি করল।

সবদিক বিবেচনা করে ট্রেভিস দেখল যে ছিয়ানব্বুই ঘণ্টা অর্থাৎ চারদিনের মধ্যে আর একটা অভিযাত্রী দল কঙ্গোর ঘটনাস্থলে পৌঁছান দরকার।

সেখানে যে শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেছে তা এখনও কেউ জানে না এমন কি জেয়ার সরকারও না। ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়লে জেয়ার সরকার আর একটা অভিযাত্রী দলকে জেয়ারে প্রবেশ করার অনুমতি দেবে না। তাছাড়া ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়লে ইউরোপ অ্যামেরিকায় কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে কে জানে। হয়তো তাদের হাস্যাস্পদ হতে হবে। যে ভাবে মানুষগুলোর মাথা গুঁড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে তা কেউ বিশ্বাস করবে না। বলতে পারে আরিটেসা ব্যর্থ হয়ে গাঁজাখুরি কারণ প্রচার করছে।

পরদিন সকালে নিজের চেম্বারে এসেই ট্রেভিস বিভিন্ন বিভাগের কর্তাদের ডেকে পাঠিয়ে বললো, আমি এখনি জেয়ারে মানে কঙ্গোতে আর একটা অভিযাত্রী দল পাঠাতে চাই যে দল ছিয়ানব্বুই ঘণ্টার মধ্যে কঙ্গোর রেন ফরেস্টে পৌঁছবে। এখন তোমরা বল কি করে ব্যবস্থা করা যায়।

কোনো অভিযানে যাবার আগে প্রয়োজনীয় মালপত্র যে যোগাড় করে সেই ক্যামেরন বলল, ছিয়ানব্বুই ঘণ্টা কি বলছেন? আমার অন্ততঃ একশো ষাট ঘণ্টা সময় চাই।

ট্রেভিস বললো, তাহলে হিমালয়ে আমরা যে দল পাঠাচ্ছি সে দল আপাততঃ বাতিল করে তাদের মালপত্র প্লেনে তুলে দাও।

কিন্তু সেটা তো একটা পর্বত অভিযান ?

কিছু মাল তুমি অদলবদল করতে পার, ধর ন' ঘণ্টার মধ্যে ?

পরিবহন বিভাগের কর্তা লিউইস বলল, ক্যামেরন না হয় তা করল কিন্তু মাল ও মানুষ পাঠাবার বিমান কোথায় ?

ট্রেভিস বলল, লিউইস তুমি কোনো খবর রাখ না যদিও এই খবরটা আমি তোমার মুখ থেকে শুনলে ভাল হ'ত।

কি খবর ?

কোরিয়ান এয়ার লাইনসের একখানা সেভেন ফোর সেভেন কার্গো জেট এখনি পেতে পার, যে পার্টির যাবার কথা ছিল সেই পার্টি শেষ মুহূর্তে তাদের যাত্রা ক্যানসেল করেছে। তারা বলেছে আরও ন' ঘণ্টা সময় পেলেই তারা যাবার জন্যে রেডি হতে পারবে।

অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট আরউইন টুক করে একটা প্রশ্ন করল, কত ডলার আন্দাজ লাগবে ? সেটা এখনি জানতে পারলে ভাল হয়, আমাকে ত আবার আসল মালেরই যোগাড় করতে হবে।

পাসপোর্ট ভিসা ইত্যাদির যে ব্যবস্থা করে সেই মার্টিন বলল, তুমি থাম আরউইন, ভিসা পাওয়া চাই তো আগে, নইলে ওরা যাবে কি করে ? ওয়াশিংটনে জেয়ার এমব্যাসি থেকে সময়মতো ভিসা পাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার তা ছাড়া আর একটা ব্যাপার আছে। জেয়ারে খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান করার ক্ষমতা আমাদের দেওয়া হয়েছিল, তারই জন্যে জেয়ার আমাদের ভিসা মঞ্জুর করেছিল। এখন এদিকে জাপান, ডাচ আর জার্মানরা মিলে একটা যৌথ প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ কনসরটিয়ম গঠন করেছে। তারাও জেয়ারে খনিজ সম্পদ আহরণের অনুমতি পেয়েছে তবে আমরা আগে দরখাস্ত করেছিলুম বলে আগে ভিসা পেয়েছিলুম কিন্তু এখন জেয়ার দ্বিতীয়বার ভিসা মঞ্জুর করতে রাজি নাও হতে পারে বিশেষ করে তারা যদি টের পায় আমরা কোনো বিপদে বা অসুবিধায় পড়েছি। সেক্ষেত্রে তারা ঐ কনসরটিয়মকেই অনুমতি দেবে। এজন্য জাপানীরা একাই তো জলের মতো ইয়েন খরচ করছে।

এটা অবশ্যই ভাববার কথা, আমরা বিপদে পড়েছি জানতে পারলে ওরা কি করবে বলা যায় না তবে ওরা জানবে কি করে ? ট্রেভিস জিজ্ঞাসা করে।

যে মুহূর্তে আমরা ভিসার জন্য আবেদন করব সেই মুহূর্তেই ওরা টের পাবে। মার্টিন বলল।

কিন্তু ভিসা তো আমরা আগেই পেয়েছি, নতুন করে আবার আবেদন করার দরকারটা কি ? ভিরুঙ্গাতে আমাদের একটা দল কাজ করছে। আমরা এখন একটা ছোট দল যদি পাঠাতে চাই।

কিন্তু ভিসা তো ইস্যু করা হয় ব্যক্তিগত নামে, কোনো দলকে নয়, মার্টিন বলল।

ঠিক বলেছ মার্টিন, তাহলে সুরার বোতলগুলো আছে কি করতে ? মদের বোতল, ট্রানজিস্টর রেডিও, টেপ রেকর্ডার আর পোলারয়েড ক্যামেরা ঘুস দিয়ে অনেক কাজ উদ্ধার করা হয়।

কিন্তু সীমান্ত পার হওয়া যাবে কি করে ?

সে রকম লোকও আছে যে আমাদের দলকে বর্ডার ক্রস করিয়ে দেবে, ধর মানরো।

মানরো ? সে কি সৎ লোক ? জেয়ার সরকার তাকে বিশ্বাস করে না, মার্টিন বলল।

মানরো কিন্তু করিৎকর্মা লোক, আফ্রিকার প্রায় সব দেশ তার জানা, কর্তাদের সঙ্গে তার দহরম মহরমও আছে। টাকা পেলে সে যে কোনো কাজ উদ্ধার করতে পারে, মানরো ক্যান ডু ইট।

আমি বলতে পারি না। আমরা তাহলে এমন একজন লোকের তদারকিতে একটা অবৈধ দল পাঠাচ্ছি যে একদা কঙ্গোর ভাড়াটে সৈন্য ছিল···

আরে তা কেন ? আমি বলতে চাই যে আমার তো একটা দল কঙ্গোতে রয়েছেই, তাদের শক্তি বাড়াতেই ছোট একটা দল পাঠানো জরুরী হয়ে পড়েছে, এরকম তো হতেই পারে।

অনেক আলাপ আলোচনা ও অনেক টেলিফোন কল করার পর স্থির

হলো সেই দিনই ১৪ জুন রাত্রি আটটায় মালপত্তর নিয়ে একটা ছোট পার্টি সেভেন ফোর সেভেন বিমানে রাত্রি আটটায় ইউস্টন ত্যাগ করবে এবং ১৫ জুন আফ্রিকা পৌঁছে মানরোকে তুলে নেবে কিংবা অনুরূপ কোনো ব্যক্তিকে এবং দলটি ১৭ জুন তারিখে কংগোর রেনফরেস্টে ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারবে। অর্থাৎ ছিয়ানব্বুই ঘণ্টার মধ্যে।

সমস্ত প্রোগ্রামটা কমপিউটরে যাচাই করে নেওয়া হলো। গ্রীন সিগন্যালও পাওয়া গেল। কমপিউটারই গ্রীন সিগন্যাল দিলো।

ট্রেভিস যখন বিভিন্ন বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে কনফারেন্স করছিলো ক্যারেন তখন নিজের তৈরি ছোট একটা কমপিউটারের সামনে বসে বোতাম টিপে কাঁটা ঘুরিয়ে রেন ফরেস্টের ভিডিও টেপগুলো পরীক্ষা করছিলো। গোরিলারা যে কাণ্ডটা ঘটিয়েছে সে বিষয়ে ক্যারেন নিশ্চিত হয়েছে যদিও তার চিফ তা বিশ্বাস করে না। চিফ বললো গোরিলারা এভাবে নরহত্যা করে না। ক্যারেন বলে সেইটেই তো রহস্য, গোরিলারা এইভাবে নরহত্যা করল কেন? সেই রহস্য ভেদ করতে হবে। এমনও তো হতে পারে যে প্রাণীগুলো গোরিলার মতো দেখতে হলেও ঠিক গোরিলা নয়, কিছু পার্থক্য আছে। তাহলে সেই প্রাণীও দেখা দরকার।

বিখ্যাত শিকারী মার্টিন জনসন কঙ্গোতে গোরিলা নিয়ে অনেক নাড়াচড়া করেছিলেন। তাঁর বইখানা একবার পড়ে দেখতে হবে। তিনি ডকুমেণ্টারি ফিল্মও তুলেছিলেন, বোধ হয়, ১৯২৮।২৯ সালে, সেই ফিল্ম এখনও যদি আরকাইভে থাকে তাহলে সেটি দেখা দরকার। কঙ্গোতে সে যাবেই।

ট্রেভিসের কনফারেন্স শেষ হয়েছিল। নিজের চেম্বারে সে একা বসেছিলো। ক্যারেন তার ঘরে ঢুকে সামনের চেয়ারে বসলো।

কোনো ভূমিকা না করে ট্রেভিস বললো, বেশ ক্যারেন আমি যদি তোমার সিদ্ধান্ত মেনে নিই তাহলেও আমি বুঝতে পারছি না আমাদের পরবর্তী অভিযাত্রী দলের তুমি কেন নেত্রী হবে?

সে কথা পরে হবে, তুমি যে আর এক দলকে ভিডিও টেপ পরীক্ষা করতে

দিয়েছিলে তারা কি বলে ?

তাদের কাজ এখনও শেষ হয় নি, তুমি অবশ্য ওদের অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছ।

এইজন্যেই তো আমি নতুন অভিযাত্রী দলের নেতৃত্ব দাবি করছি কারণ কমপিউটারের সমস্ত ডেটা নিয়ে দ্রুত কাজ করতে হবে। কমপিউটার আমাদের কি দিতে পারে তা বোধহয় তোমারও ধারণা নেই। কমপিউ-টার কি দেবে আমি সে আশায় বসে থাকি না, আমি তার কান মুলে তার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিই।

ট্রেভিসকে ক্যারেন নিরীক্ষণ করতে লাগলো। সে অসাধারণ বুদ্ধিমতী। সে বুঝতে পারলো ট্রেভিস মনে মনে তার কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। নতুন অভিযাত্রী দলের সে নেতৃত্ব পাবেই।

সে বললো, তোমার একটা অনুমতি চাই। আমি বাইরের একজন এক্স-পার্টের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই, সে এক্সপার্ট আমাদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পায়, ঠিক বাইরের লোক নয়।

তাহলেও আরিটেসা-এর ভেতরের লোক নয়। বাইরের লোককে আমি ভয় পাই কারণ কনসরটিয়ম আমাদের তথ্য সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু এটা জরুরী এবং যে বিষয়ে পরামর্শ করব সে বিষয় কনসরটিয়ম জানতে পারলেও কাজে লাগাতে পারবে না। সেই এক্সপার্টকে আমি বিশ্বাস করি।

তাহলে তুমি বলছ পরামর্শ করাটা খুবই জরুরী ?

হ্যাঁ, জরুরী।

যদি জরুরী মনে কর তাহলে আর দেরি কোরো না।

ক্যারেন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর ট্রেভিস চিন্তা করতে বসলো। ক্যারেন যে কাজের মেয়ে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সবে তার চব্বিশ কি পঁচিশ বছর বয়স। সেই বয়সেই নানা বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছে,

অনেক জটিল বিষয় সরল করেছে, কোনো কোনো পুরনো ধারণা বদলে নতুন আলোকপাতও করেছে। এ মেয়েকে অবহেলা করা যায় না।

কিন্তু তার একটা ত্রুটি আছে। সে যেন হাসতে জানে না। আরিটেসা-এর বিজ্ঞানীরা ওকে বলে 'রস গ্লেসিয়ার'। যার ফলে সে কাজ আদায় করতে পারে না। দলের নেতৃত্ব করার আরও একটা বাধা আছে।

মাত্র পনেরো দিনের এবং ক্ষুদ্র দলের মিনি অভিযানেও খরচ হবে তিন লাখ ডলার। ইকনমিক অ্যাডভাইসার তাকে প্রশ্ন করবে, এত ব্যয়বহুল একটা অভিযানের ভাব দেবে তুমি একটা ছুঁড়ির ওপর? অমন বিপদ-সংকুল দেশে?

দেখা যাক ক্যাবেন রস সম্বন্ধে কমপিউটর কি বলে? কমপিউটর যদি উত্তম বলে তাহলে কমপিউটাবের রিপোর্ট সে ইকনমিক অ্যাডভাইসারকে দেখিয়ে দেবে। তখন আর আপত্তির কারণ থাকবে না।

ক্যারেন রসের কাজের সঙ্গে পরিচিত থাকলেও কমপিউটব যে বিপোর্ট দিলো তা অতি উত্তম। কমপিউটার অনুসারে এক কথায় ক্যাবেন একটি অসাধারণ প্রতিভা।

ট্রেভিসের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসবার সময় ক্যারেন বুঝতে পেরেছিল ট্রেভিস তাকে উপেক্ষা করতে পাববে না। তাকেই দলেব ভার দিতে হবে। নিজের ঘরে ফিরে এসে সে অফিসের রেফারেন্সসেকশনে যেয়ে বললো, বাইরের যেসব রিসার্চ স্কলার ও বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্যে অর্থ সাহায্য করা হয় তার একখানা লিস্ট দিন।

জীবজন্তু ও বণ্যপ্রাণী নিয়ে যারা কাজ করছে এমন চৌদ্দজন বিজ্ঞানীর নাম পাওয়া গেল। এইসব বিজ্ঞানীরা কেউ কাজ করছে বোর্নিওতে, কেউ ম্যালেসিয়াতে, কেউ আফ্রিকাতে। অ্যামেরিকাতেও কয়েকটা নাম পাওয়া গেল তাদের মধ্যে একজনই শুধু গোরিলা নিয়ে গবেষণা করছে। এই নামটাই ক্যারেন খুঁজছিল।

বিজ্ঞানীর নাম ডঃ পিটার ইলিয়ট, ক্যালিফোরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্কলেতে সে গবেষণায় লিপ্ত আছে। বয়স উনত্রিশ, অবিবাহিত, প্রাণিবিজ্ঞান

বিভাগে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। গবেষণার প্রধান বিষয় "জীবজন্তুর সঙ্গে বার্তা আদান প্রধান (গোরিলা)"। আরিটেসা তাকে অর্থসাহায্য করে, 'প্রজেক্ট টাই-টাই" খাতে।

ক্যারেন এই বিজ্ঞানীর নাম আগে শুনেছিল। যার কাছ থেকে পিটারের নাম শুনেছিল সে পিটারের উচ্চ প্রশংসা করেছিল। যাইহোক বার্কলেতে একবার টেলিফোন করে দেখা যাক। ইউস্টন থেকে বার্কলেতে ডায়াল করে সরাসরি ফোন করার ব্যবস্থা আছে।

লাইন যুক্ত হতেই ওপার থেকে পুরুষ কণ্ঠে বলল, হ্যালো।

ডঃ পিটার ইলিয়ট ?

হ্যাঁ ··কিন্তু···তুমি কি কোনো রিপোর্টার ?

না, আমার নাম ডঃ ক্যারেন রস্ ইউস্টন থেকে কথা বলছি, আমি আর্থ রিসোরসেস টেকনোলজি সারভিস-এর ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ড থেকে কথা বলছি। এই ফাণ্ড তোমার গবেষণায় তোমাকে অর্থসাহায্য করে।

হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু তুমি একজন ছদ্মবেশী রিপোর্টার নয় তো ? তোমার দরকারটা কি ?

রিপোর্টার হলেও টেলিফোনে এত দূরে একজন মেয়েকে তোমার এত ভয় ? যাক শোনো, আমরা কঙ্গোর ভিরুঙ্গা অঞ্চলে এখনি একটা অভিযাত্রী দল পাঠাচ্ছি।

তাই নাকি ? কবে যাচ্ছে ? উৎসাহে পিটার বালকের মতো চঞ্চল হয়ে উঠলো।

দিন দুয়েকের মধ্যেই।

আমি তোমাদের সেই অভিযাত্রী দলের সঙ্গে যেতে চাই।

ক্যারেন এতটা আশা করে নি। সে বলল, তোমাকে টেলিফোন করার আমার আপাততঃ উদ্দেশ্য ভিন্ন···

উদ্দেশ্য তোমার যাইহোক আমি দলে থাকতে চাই, আমি টাই-টাইকে সঙ্গে নিয়ে ভিরুঙ্গা যাবার চেষ্টা করছি।

টাই-টাই কে ?

টাই-টাই একটা গোরিলা, ফিমেল গোরিলা।

পিটার ইলিয়ট যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিল তা হঠাতই আরম্ভ হয়েছিল। গবেষণার আংশিক বিষয়, প্রকাশিত হতে না হতেই সে হাস্যাস্পদ হয়েছিল। কি আজগবি ব্যাপাব! গোরিলারা আবার মানুষের মতো কথা বলে, বোঝে? এই নিয়ে আবার রিসার্চ! এইজন্যেই পিটার ইলিয়ট রিপোর্টারদের ভয় কবে। তারা তার রিসার্চের অপব্যাখ্যা কবে। পিটার তখন বার্কলেতে অ্যানথ্রোপলজি বিভাগে সবে যোগ দিয়েছে। তখনও সে ছাত্র। সেই সময় সে পড়েছিল যে এক বছর বয়সী একটি গোরিলাকে মিনিয়েপোলিস চিড়িয়াখানা থেকে বিমানে সানফ্রানসিসকো স্কুল অব ভে[illegible] মেডিসিনে চিকিৎসার জন্যে আনা হয়েছে। গোরিলাটির অ্যামবিক ডিসেনট্রি হয়েছে। এ হলো ১৯৬১ সালের কথা, পিটারের বয়স তখন তেইশ। এই বছরেই অনেকে দ্বিপদ জন্তু যথা—বাঁদর, গোরিলা, শিম্পাঞ্জি, বেবুন ইত্যাদির ভাষা নিয়ে গবেষণা শুরু করে।

এই সকল দ্বিপদ জন্তুদের যে ভাষা শেখানো যেতে পারে এমন ধারণা বহুদিন আগেই শুরু হয়েছিল। ১৬৬১ সালে স্যামুয়েল পেপিস তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন যে লণ্ডনে একটি শিম্পাঞ্জি দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। শিম্পাঞ্জিটির ভাবভঙ্গি মানুষের মতো। ইংরেজিতে কথা বললে সে বোঝে, তাকে হয়তো কথা বলতে অথবা ইসারা করতে শেখানো যেতে পারে। ঐ শতকেই আর একজন লেখক লিখেছেন যে বাঁদর ও বেবুন কথা বলতে পারে, কিন্তু ভয়ে বলে না কারণ তাহলে তাদের কোনো কাজে লাগিয়ে দেওয়া হবে।

এরপর গত তিনশত বৎসরে এইসব জন্তুদের কথা বলতে শেখানোর চেষ্টা অনেকবারই হয়েছিল কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। তারপর শোনা যায় ১৯৫০ সালে কিথ এবং কেটি হেইজ নামে ফ্লোরিডার এক দম্পতি ভিকি নামে একটি শিম্পাঞ্জিকে ছ' বছর ঠিক মানবশিশুর মতোই পালন করতে

থাকে। এই সময়ের মধ্যে ভিকি চারটে শব্দ শিখেছিল। মামা, পাপা, কাকা, এবং কাপ কিন্তু উচ্চারণ স্পষ্ট ছিল না এবং কথা বলতে শেখাতে দীর্ঘ সময়ও লাগছিল।

নেভাডার রেনো শহরে ১৬৬১ সালে অ্যালেন এবং বিয়াট্রিস গার্ডনার নামে এক দম্পতি ভিকি সম্বন্ধে একটি ডকুমেণ্টারি ফিল্ম দেখেন। তারা লক্ষ্য করে যে ভিকির কথা বলার বা ঠোঁট নাড়ার চেষ্টা মোটেই সাবলীল নয় কিন্তু তার হাত ও পা চালনা বা কিছু ইসারা ইঙ্গিত বেশ সহজ। তাদের ধারণা হয় যে চেষ্টা করলে হয়তো শিম্পাঞ্জিদের সাইন ল্যাংগুয়েজ শেখানো যায় যে সাইন দ্বারা মানুষ মূক বধিররা মনোভাব প্রকাশ করে।

গার্ডনার দম্পতি ওয়াশু নামে একটি শিম্পাঞ্জি শিশুকে সাইন ল্যাংগুয়েজ শেখাতে আরম্ভ করে। আশ্চর্যের বিষয় ওয়াশু এই নির্বাক ভাষা দ্রুত আয়ত্ত্ব করতে থাকে। আগে দেখে নি এমন কোনো বস্তু দেখালে সে নতুন শব্দ গঠন করেও বস্তুটির নাম বলতো যেমন তাকে ওয়াটার মেলন (তরমুজ, খরমুজ) দেখানো হলে সে তার নির্বাক ভাষায় বলল ওয়াটার ফ্রুট।

শিম্পাঞ্জিকে কথা বলবার জন্যে কমপিউটারের সাহায্যও নেওয়া হয়েছে। লুসি নামে একটি শিম্পাঞ্জিকে নিয়ে এমন চেষ্টা করা হয়েছিলো। সারা নামে একটি সিম্পাঞ্জিকে ইসারা করলে সে কোনো বস্তু তুলে আনত। একটা শিম্পাঞ্জি তো একটা রেস্তরাঁয় কাজ করত। সে টেবিল থেকে কাপ প্লেট তুলে এনে যথাস্থানে রেখে দিত। খরিদ্দাররা কিছু চাইলে সে দিতে পারত।

বানর জাতীয় অন্য পশুদের নিয়েও পরীক্ষা আরম্ভ হয়। অ্যালফ্রেড নামে একটি ওরাংওটানকে নিয়ে কাজ আরম্ভ করা হয় তারপর কোকো নামে একটি গোরিলাকে শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়। টাই-টাইকে পিটার ইলিয়ট শিক্ষা দিতে শুরু করে ১৬৬১ সাল থেকে। পিটার শুনেছিল ইণ্ডিয়ার উত্তর প্রদেশ স্টেটে মির্জাপুর ডিস্ট্রিক্টের শিউপুরা গ্রামে "বেহোড়িয়া" নামে এক সম্প্রদায় আছে তারা পশু বশ করতে ওস্তাদ। কারণ তারা পশুর ভাষা

বোঝে ও কথা বলে কিন্তু পিটার অনেক চেষ্টা করেও তাদের সন্ধান করতে পারে নি।

মিনিয়েপোলিস চিড়িয়াখানা থেকে সেই যে গোরিলা শিশুটিকে স্যানফ্রানসিসকো ভেটেরিনারি স্কুলে আনা হয়েছিল তারই নাম টাই-টাই। পিটার টাই-টাইকে হাসপাতালে দেখতে যায়। বেচারী তখন খুব দুর্বল ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিলো তবুও চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে তার হাত পা বেঁধে রাখা হয়েছিলো।

পিটার তার গায়ে হাত দিয়ে বললো, হ্যালো টাই-টাই আমি পিটার। টাই-টাই পিটারের আদরের মর্ম বুঝল না। সে তার হাত কামড়ে রক্ত বার করে দিলো।

গোরিলা শিশুর সঙ্গে ভাব জমাতে যাওয়াটা পিটারের পক্ষে আনন্দদায়ক হয় নি কিন্তু তার মাথায় নতুন আইডিয়া এল। সে স্থির করলো টাই-টাই-এর সে ভার নেবে, সাইন ল্যাংগুয়েজ শেখাবে। বানর জাতীয় পশুদের কি ভাবে সাইন ল্যাংগুয়েজ শেখানো যেতে পারে সে বিষয়ে ইতিমধ্যে কিছু পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলেও সেগুলি প্রধানতঃ পুঁথিপত্তরে নিবদ্ধ ছিল। সেসব পড়ে পিটার বুঝলো এইসব পদ্ধতির কিছু গ্রহণ কিছু বর্জন এবং কিছু সংশোধন করে গোরিলাকে নির্বাক-কথা বলতে শেখানো যায় কিন্তু তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

আর্থ রিসোরসেস ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ডের কাছে পিটার দরবার করলো। তার আবেদন মঞ্জুর হলো এবং "প্রোজেক্ট টাই-টাই" গঠিত হলো। টাই-টাইকে নির্বাক'ভাষা শেখাতে আটজন লোক চাই তার মধ্যে থাকবে একজন শিশু মনোবিদ্ এবং একজন কমপিউটার টেকনিশিয়ান। প্রোজেক্ট টাই-টাই-এর জন্য বরাদ্দ হলো বছরে এক লক্ষ ষাট হাজার ডলার।

অর্থ মঞ্জুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টাই-টাইকে বার্কলেতে আনা হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যামপাসের মধ্যে তার জন্য বিশেষ করে ঘর তৈরি করা হলো। ঘরের মধ্যে তার স্বাচ্ছন্দ্যের সব ব্যবস্থা ছিল এছাড়া টেপ-রেকর্ডার টিভি

এবং আরও দু একটা যন্ত্র বসানো হয়েছিলো যেগুলো সব বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

মনে হয় অন্য গোরিলা অপেক্ষা টাই-টাই-এর বুদ্ধি কিছু বেশি এবং তার শিক্ষকের ধৈর্য ও দক্ষতাও কিছু বেশি নইলে বনের পাহাড় থেকে ধরে আনা একটা গোরিলা শাবককে ভাষা শেখানো কম কথা নয়। সার্কাসের প্রাণীদের খেলা শেখাতে কি অসীম ধৈর্য ও দক্ষতার প্রয়োজন হয় সে তো সকলেই জানেন, আর এ হলো একটা জন্তুকে ভাষা শেখানো, সে যে কি দুরূহ ব্যাপার তা সহজেই অনুমেয়।

যাইহোক টাই-টাই দ্রুত শব্দ-চিহ্নগুলি আয়ত্ত করতে লাগলো। সে নির্বাক ভাষা দ্বারা তার মনোভাব প্রকাশ করতে লাগলো। মাঝে মাঝে সে নতুন বা জোড়া শব্দ ব্যবহার করত।

টাই-টাই প্রতি সপ্তাহে ২·৮টি করে শব্দ-সংকেত শিখছিল। ভাল বলতে হবে। কিন্তু '১৬৬১ সালের ২ ফেবরুয়ারি তারিখের সকালে গোলমাল দেখা দিল।

রাত্রে টাই-টাই তার ঘরে একা থাকে এবং সকালে তার সঙ্গে যার প্রথমে দেখা হয় তাকে সে শুভ মর্নিং জানায়। কিন্তু সেদিন সকালে দেখা গেল তার মেজাজ ভাল নয় রীতিমতো গম্ভীর। শুভ মর্নিং-এর কোনো উত্তর দিল না। পেট ব্যথা করছে? সর্দি হয়েছে? শরীর খারাপ? টাই-টাই কোনো উত্তর দেয় না, চুপ করে বসে থাকে। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো সে বলতে চায় তার প্রতি কোনো অন্যায় করা হয়েছে।

পিটার ইলিয়টকে খবর দিতেই পিটার এসে জিজ্ঞাসা করল তার কি হয়েছে? শব্দ-চিহ্ন দ্বারা টাই-টাই জানিয়ে দিল 'স্লিপ-বক্স'।

স্লিপ-বক্স কি? টাই-টাই এমন জোড়া শব্দ-চিহ্ন ব্যবহার করে। একবার তার দুধ টক হয়ে গিয়েছিল! সে বলেছিল 'ক্রোকোডাইল মিল্ক'। ছবিতে সে কুমির দেখেছে। কুমির সে অপছন্দ করে তাই টক দুধকে সে বলেছিল ক্রোকোডাইল মিল্ক। সেটা বোঝা গিয়েছিল কিন্তু স্লিপ-বক্স বোঝা যাচ্ছে না।

তার ঘরে একটা টিভি আছে! যতক্ষণ প্রোগ্রাম চলে টিভি ততক্ষণ খোলা থাকে। টিভি কি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল? কারণ টিভি দেখতে দেখতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। নাকি সে তার শয্যাটাকে স্লিপ-বক্স বলছে? কিন্তু এই শব্দ-চিহ্ন তো আগে কখনও ব্যবহার করে নি। সে অন্য কিছু বলতে চাইছে।

অবশেষে বোঝা গেল স্লিপ-বক্স বলতে সে বোঝাচ্ছে 'স্লিপ-পিকচার্স'। যখন তাকে স্লিপ-পিকচার্স সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো সে বললো, ওগুলো 'ব্যাড পিকচার' এবং 'ওল্ড পিকচার'! টাই-টাই কেঁদেছে।

আরে! অবাক কাণ্ড! টাই-টাই মানে গোরিলা স্বপ্ন দেখেছে!

বানরজাতীয় একটা পশুও স্বপ্ন দেখতে পারে তা এই প্রথম জানা গেল। টাই-টাই প্রোজেক্টের কর্মীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল কিন্তু সেই সাড়া ক্ষণস্থায়ী হলো কারণ টাই-টাই পরপর স্বপ্ন দেখতে লাগলো, তার যে উন্নতি হচ্ছিল তাও হ্রাস পেল। তার মেজাজ খারাপ হতে থাকল। সে তার শিক্ষকদের দোষ দিতে লাগল।

টাই-টাই বিরাট আকারের একটা গোরিলা নয়, তার উচ্চতা সাড়ে চার ফুট। ওজন ১৩০ পাউণ্ড কিন্তু রীতিমতো শক্তিশালী। সে যদি ক্ষেপে যায় তবে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা মুশকিল হবে।

টাই-টাই কি স্বপ্ন দেখে? কেন তার মেজাজ খারাপ? জানবার চেষ্টা করা হলো নানাভাবে। কতরকম ছবি দেখানো হলো, তার অলক্ষ্যে তার কোনো কথা শোনার চেষ্টা করা হলো, ছবিও তোলা হলো কিন্তু তার মানসিক কোনো উন্নতি হলো না! কয়েক রকম নিউরোলজিক্যাল টেস্ট করাও হলো তবুও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

অবশেষে একটা পথ পাওয়া গেল। টাই-টাইকে ছবি আঁকতে দেওয়া হলো। নখ দিয়ে রঙিন ছবি আঁকতে শোখানো হয়েছিলো। তবে তার একটা ত্রুটি ছিল। ছবি আঁকবার সময় সে নখ চুষত, রং চেটে ফেলত, তাতে ফল ভাল হতো না। তখন ওর নখে লংকার গুঁড়ো লাগিয়ে দেওয়া হলো। টাই-টাই-এরও আঙুল চোষা বন্ধ হলো।

টাই-টাই বেশ মন দিয়ে ছবি আঁকতে আরম্ভ করলো, তার মেজাজও ক্রমশঃ ফিরে আসতে শুরু করলো। কিন্তু টাই-টাই কি আঁকত?

লম্বা মোটা সবুজ রেখা আর তার ফাঁকে ফাঁকে বিপরীত অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি রেখা। এগুলি ভিন্ন রঙে, সবুজ নয়। আর মাঝে মাঝে বৃত্ত।

মনোবিজ্ঞানী বললেন, সবুজ মোটা রেখাগুলি অরণ্য বোঝাচ্ছে। টাই-টাইকে জিজ্ঞাসা করা হলো সে কি আঁকছে। টাই-টাই উত্তর দিলো এই সবুজ মোটা লাইনগুলো হলো গাছ, অনেক গাছ, আর এই আধখানা ওলটানো চাঁদ হলো খারাপ পুরনো বাড়ি। বৃত্তগুলো কি? ওগুলো সব গর্ত। মনো-বিজ্ঞানীও টাই-টাইকে সমর্থন করলেন। তিনিও বললেন ছবি এঁকে টাই-টাই অরণ্যে কোনো পুরনো বাড়ি বোঝাচ্ছে যেগুলি সে খারাপ মনে করে আর বৃত্তগুলি যা সে গর্ত বলছে সেগুলি হলো গুহা। টাই-টাই বনের মধ্যে ঘরবাড়ি ও গুহার স্বপ্ন দেখে যা সে মোটেই পছন্দ করে না।

কোনোদিন তার পূর্বপুরুষ এই অরণ্যে বাস করত। উত্তরাধিকার সূত্রে শূক্রকীটের জিন মারফত টাই-টাই তার পূর্ব পুরুষের কোনো তিক্ত অভি-জ্ঞতা লাভ করেছে। সেই অভিজ্ঞতা টাই-টাই স্বপ্ন দেখে, তারও ভাল লাগে না, তাই সে বলছে খারাপ পুরনো বাড়ি। এই বাড়িতে যারা বাস করত তারা হয়তো গোরিলাদের ওপর অত্যাচার করত। অর্থাৎ যে বন থেকে টাই-টাইকে ধরে আনা হয়েছে সেই বনে একদা কোনো শহর ছিল এখন তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। খোঁজ করলে সেই শহর পাওয়া যেতে পারে।

১৬৬১ সালের মে মাসে টাই-টাই-এর সেই ছবিগুলি একটি বিজ্ঞান পত্রি-কায় প্রকাশ করতে দেওয়া হলো, সেই সঙ্গে একটি প্রবন্ধ। ছবি বা প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। পত্রিকার সম্পাদক সচিত্র প্রবন্ধটি পড়বার জন্যে সম্পাদকমণ্ডলীর তিনজন বিজ্ঞানীকে দেন। ঐ সচিত্র প্রবন্ধের একটি কপি কোনোভাবে নিউ ইয়র্কের প্রাইমেট প্রিজারভেশন এজেন্সির হস্তগত হয়।

বানর জাতীয় পশুর ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে এই অভিযোগ

করে ঐ এজেন্সি সোরগোল তোলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে তারা পিকেটিং করতে লাগলো। অনেক বালক ও শিশু জড়ো করলো, তাদের হাতে ব্যানার, ব্যানারে লেখা 'টাই-টাইকে মুক্তি দাও'। এই পিকেটিং সংবাদ হিসেবে টেলিভিসনেও প্রচারিত হলো।

প্রোজেক্ট টাই-টাই কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় মারাফত জানাল যে টাই-টাই-এর ওপর কোনো অত্যাচার করা হয় না, উক্ত এজেন্সি ভুল খবর পেয়েছে।

প্রাইমেট প্রিজারভেশন এজেন্সি থামল না। তারা খবরের কাগজে পিটার ইলিয়টের কাজের তীব্র সমালোচনা করলো। এই সমালোচনায় কয়েক-জন বিজ্ঞানী তাদের মতামত প্রকাশ করলো, তারা বললো, এমন ধরনের পরীক্ষা করার পিটার এলিয়টের কোনো অধিকার নেই। তার পরীক্ষা নাৎসীদের কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্পের কথা মনে করিয়ে দেয় যেখানে জার্মান বিজ্ঞানীরা হতভাগ্য ইহুদি বন্দীদের অনিচ্ছায় তাদের ওপর নানারকম পরীক্ষা চালাতো। পিটার ইলিয়টের পরীক্ষার ফলে টাই-টাই দুঃস্বপ্ন দেখছে ফলে সে মর্মপীড়ায় কাতর। টাই-টাইকে অযথা বাজে ওষুধ খাইয়ে এবং ইলেকট্রো-শ্যক প্রয়োগ করে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজন হলে তারা টাই-টাই-এর মুক্তির জন্যে আদালতে যাবে।

প্রোজেক্ট টাই-টাই স্টাফ একটি বিবৃতি প্রস্তুত করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃ-পক্ষের হাতে দিল ১০ জুন তারিখে তা খবরের কাগজে প্রকাশের জন্যে কিন্তু দুঃখের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা প্রকাশ করবার জন্যে পাঠালেন না।

প্রোজেক্ট টাই-টাই কাজ বন্ধ করে নি। টাই-টাইকে তারা সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ছবি আঁকবার সময় তার মেজাজ বেশ ভাল থাকে কিন্তু পরে আবার খারাপ হয়।

কঙ্গোতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কিছু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এমন কোনো ধ্বংসাবশেষ টাই-টাই হয়তো দেখেছে এই অনুমানকে ভিত্তি করে সারা জনসন নামে একজন আরকিওলজিক্যাল রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট সেই-

সব ধ্বংসাবশেষগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করলো। মিউজিয়ম ও লাইব্রেরিতে যেয়ে সে পুরনো বইপত্তর ঘাঁটতে লাগলো।

পশ্চিমী কোনো অভিযাত্রী দল এইসব ধ্বংসাবশেষ দেখে নি। যখনি চেষ্টা করছে তখনই স্থানীয় আদিবাসী বা উপজাতিদের কাছ থেকে প্রবল বাধা পেয়েছে।

এইজন্য কঙ্গোর প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। সারা জনসন আশা ছাড়ল না। সে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে লাগলো।

বিদেশীদের মধ্যে সর্বপ্রথম আরব ও পোর্টুগিজ দাস ব্যবসায়ীরা কঙ্গোতে প্রবেশ করেছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের ভ্রমণ কাহিনী লিখে রেখে গেছে নিজস্ব ভাষায়। সারা জনসন আরবী ও পোর্টুগিজ ভাষা বিশেষ করে প্রাচীন ভাষা পড়তে জানে না।

কিন্তু সেই সব আরবী ও পোর্টুগিজ পুস্তকে কিছু ছবিও ছিল। বইগুলি প্রাচীন, ছবিগুলিও প্রাচীন। একখানা ছবি দেখে সে চমকে উঠল। অদক্ষ শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি, ভ্রমণকারী নিজেই হয়তো এঁকেছে। সারা যেন এই ছবিখানাই খুঁজছিলো।

ছবির তলায় একটা তারিখ দেওয়া আছে, ১৬৪২ খ্রীস্টাব্দ, অর্থাৎ ঐ বছরে ছবিখানা আঁকা হয়েছিল। যে বইখানায় ছবিটা ছাপা হয়েছে তা ১৮৪২ সালে ছাপা হয়েছে।

ছবিখানিতে দেখা যাচ্ছে গভীর অরণ্যের মধ্যে একটি শহরের অনেক ভাঙা বাড়ি যার ওপর গাছ, লতা ও ফার্ণ গজিয়েছে। দরজা বা জানালার যেটুকু দেখা যাচ্ছে তার খিলানগুলি অর্ধবৃত্তাকার ঠিক টাই-টাই যেমন এঁকেছিলো।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে এমন আবিষ্কার হঠাৎ হয়ে যায়। ছবির তলায় ঐ ১৬৪২ তারিখ ব্যতীত আর একটা শব্দ পড়া যাচ্ছে, 'জিঞ্জ' অর্থাৎ ঐ প্রাগৈতিহাসিক শহরের নাম জিঞ্জ।

সেই বই অনুবাদের জন্য অভিজ্ঞ অনুবাদকের সাহায্য নেওয়া হলো। অনুবাদ অবশ্যই চলবে কিন্তু একটা প্রশ্ন উঠলো। এই প্রশ্ন নিয়ে বর্তমানে

পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। মানুষের শুক্রকীটে যে জিন আছে এবং তার মধ্যে যে ডি-এন-এ এবং আর-এন-এ আছে তাদের মাধ্যমে পরবর্তী বংশধর উত্তরাধিকারীর কোনো গুণ বা স্মৃতি পায় কিনা।

টাই-টাইকে পশু ব্যবসায়ীরা যখন ধরে এনেছিল তখন সে গোরিলা হলেও নেহাতই শিশু, কিছুই তার মনে থাকার কথা নয় অথচ টাই-টাই যে প্রাচীন ভাঙা শহরের ছবি আঁকল তাতো আছে। এ ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে টাই-টাই তার উত্তর পুরুষের জিন মারফত পুরনো স্মৃতি পেয়েছে। তার সেই উত্তর পুরুষ হয়তো ঐ প্রাচীন শহরের জঙ্গলের মধ্যে থাকত। টাই-টাই তো শুধু ছবি আঁকে নি, স্বপ্নও দেখেছে, যে স্বপ্ন দেখেছে তারই ছবি সে এঁকেছে।

প্রোজেক্ট টাই-টাই স্টাফ সিদ্ধান্ত নিলো তারা টাই-টাইকে কংগো নিয়ে যাবে এবং সম্ভব হলে ঐ জিঞ্জ শহরে। এজন্যে প্রচুর অর্থের দরকার। অর্থ আসবে কোথা থেকে? শুধু দুজন লোকের সঙ্গেই যদি টাই-টাইকে পাঠানো হয় তাহলেই খরচ পড়বে তিরিশ হাজার ডলার। এছাড়া একটা গোরিলাকে নিয়ে যাওয়ার ঝামেলা কি কম?

আর এই সময়েই ক্যারেন রস ইউস্টন থেকে পিটার ইলিয়টকে টেলিফোন করে জানালো যে তারা দু'দিনের মধ্যে কঙ্গো যাচ্ছে। টাই-টাইকে সঙ্গে নেওয়া দূরের কথা, পিটার ইলিয়টকে সঙ্গে নেবে কিনা এ বিষয়ে কোনো কথা টেলিফোনে না হলেও ক্যারেন রস বার্কলেতে যেয়ে পিটারের সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে চায়।

পিটার সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায়, ক্যারেনকে সাদর আমন্ত্রণ জানালো। এই সুযোগে সে টাই-টাইকে কঙ্গো পাঠাবার প্রস্তাবটা পেশ করতে পারবে।

পিটার ইলিয়ট খবর পেল যে প্রাইমেট প্রিজারভেশন এজেন্সির মুখপাত্র ইলিনর প্রাইস টাই-টাই-এর মুক্তি দাবি করে আদালতে কেস লড়বে,

সজ্ঞানে মিস ইলিনর স্যাম ফ্রানসিসকোর বিখ্যাত অ্যাটর্নি মেলভিন বেলির সঙ্গে পরামর্শ করেছে অতএব তারও উচিত একজন অ্যাটর্নির পরামর্শ দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে পিটার জন মর্টন নামে একজন অ্যাটর্নির সঙ্গে দেখা করলো। মিঃ মর্টন পিটারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কাগজে বলপেন দিয়ে নোট করতে লাগলেন।

জন মর্টন বললো, কয়েকটা প্রশ্ন মিঃ ইলিয়ট, টাই-টাই একটি গোরিলা ?

হ্যাঁ, ফিমেল মাউণ্টেন গোরিলা।

বয়স ?

সাত বছর।

তাহলে এখনও শিশু।

তা না, ছয় থেকে আট বছর বয়সের মধ্যে গোরিলারা বয়ঃসন্ধি পার হয়, এখন ওকে আমাদের একটি ষোড়শী মেয়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে তবে ও এখনও নাবালিকা।

ওকে কোথা থেকে পেলেন ?

আমি ওকে পেয়েছি মিনিয়েপোলিস চিড়িয়াখানা থেকে কিন্তু তার আগে মিসেস সোয়েনসন নামে একজন মহিলা ভ্রমণকারী ওকে আফ্রিকার বাগিমিণ্ডি গ্রামে কিনে অ্যামেরিকায় নিয়ে এসে মিনিয়েপোলিস চিড়িয়াখানায় দান করেন। তখন টাই-টাই একেবারে শিশু। ওর মাকে স্থানীয় অধিবাসীরা মেরে ফেলেছিল, তারা গোরিলার মাংস খায়। আমি মিনিয়েপোলিস চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ওকে চেয়ে নিয়েছি, কিছু পরীক্ষা এবং গোরিলার অভ্যাস আয়ত্ত করবার জন্যে।

এজন্য আপনি কিছু টাকা দিয়েছিলেন কি ?

না, এক ডলারও নয়, আমি চাইতেই ওরা আমাকে নিয়ে যেতে বললেন তবে তিন বছরের জন্যে। এজন্যে কোনো লিখিত চুক্তি হয় নি তারপর তিন বছর পূর্ণ হতে আমি ওকে আরও ছ'বছর রাখতে চাইলে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ রাজি হয় এবং এবারও কোনো লিখিত চুক্তি হয় নি, বলতে কি ওরা যেন টাই-টাই সম্বন্ধে আর আগ্রহী নয়। ওদের অবশ্য আরও

চারটে গোরিলা আছে।

একটা গোরিলার দাম কত?

তা বর্তমানে কুড়ি থেকে তিরিশ হাজার ডলার হতে পারে, পিটার উত্তর দিল। তবে গোরিলা কেউ পোষবার জন্য কেনে না, বিপজ্জনক পশু তো।

মর্টন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলো, এতদিন আপনি গোরিলাটা নিয়ে কি পরীক্ষা করছেন? ভাষা শেখাচ্ছেন নাকি? কথা বলতে শিখেছে?

হ্যাঁ ভাষা শেখাচ্ছি তবে সে কথা বলতে পারে না, তাকে আমি অ্যামেরিকান সাইন ল্যাংগুয়েজ শেখাচ্ছি, হাতের ও আঙুলরে সংকেতে নির্বাক ভাষায় সে আমার সঙ্গে কথা বলে। এতদিনে সে ছ'শো কুড়িটা শব্দ-সংকেত শিখেছে, খুব ভাল বলা যায়।

যখন কোনো পরীক্ষা করেন তখন কি গোরিলাটার অনুমতি নেন?

হ্যাঁ, প্রতিবার।

আপনি কি তাকে শাস্তি দেন?

শিশু কথা না শুনলে তার বাপ মা তাকে শাস্তি দেয়। আমিও সেইরকম শাস্তি দিই, আমার কথা না শুনলে তাকে ঘরের কোণে দেওয়ালেব দিকে মুখ করিয়ে দাঁড় করিয়ে দিই কিংবা তাব বিকেলের ববাদ্দ খাবার কম করে দিই।

অন্য কোনো কঠোর শাস্তি বা শ্যক্ ট্রিটমেণ্ট?

এসব একেবারেই বাজে কথা বরঞ্চ আমারই ভয় হয় কোনোদিন সে ক্ষেপে যেয়ে আমাকেই না শাস্তি দেয়।

ঠিক আছে মিঃ ইলিয়ট আপনার কোনো ভয় নেই তবে দরকার হলে আপনি গোরিলাটাকে অদালতে হাজির করতে পারবেন?

তা পারব, আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে আপনার?

না, আপাততঃ কিছু নেই।

আজ তাহলে আমি আসতে পারি?

আজ এই পর্যন্ত থাক, জন মর্টন বললেন।

হ্যাণ্ডশেক করে বিদায় নেবার সময় পিটার ইলিয়ট জিজ্ঞাসা করল,

আচ্ছা আমি যদি গোরিলাটি দেশের বাইরে নিয়ে যাই ?
আপনার সেরকম কোনো মতলব আছে নাকি ? তাহলে দেরি করবেন না এবং ওকে বাইরে নিয়ে যেতে চান এ কথা কাউকে বলবেন না।

অ্যাটর্নির অফিস থেকে ফিরে ইউনিভারসিটিতে জুওলজি ডিপার্টমেণ্টে নিজের ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে পিটারের সেক্রেটারি ক্যারোলিন বললো, ইউস্টন থেকে ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ডের ডঃ ক্যারেন রস টেলিফোন করেছিলেন, তিনি স্যান ফ্রানসিসকো আসছেন। এছাড়া একজন জাপানী ভদ্রলোক মিঃ হাকামিচি তিন বার ফোন করেছিলেন। দশটার সময় প্রোজেক্ট টাই-টাই-এর স্টাফ মিটিং আছে এবং উইণ্ডি আমাদের ডিপার্টমেণ্টে এসেছে।
ঠিক আছে, আমাকে একটু বসতে দাও তারপর উইণ্ডিকে ডাক। সে নিশ্চয় নতুন কোনো খবর এনেছে।
উইণ্ডি অর্থাৎ জেমস ওয়েলডন একজন সিনিয়র প্রফেসর। তাকে সকলে উইণ্ডি নামে ডাকে। টেবিলে কয়েকটা খুচরো কাজ সেরে উইণ্ডিকে ডেকে না পাঠিয়ে পিটার নিজেই উইণ্ডির ঘরে গেল।
ঘরে ঢুকতেই উইণ্ডি বলল, কি হে পিটার তুমি নাকি তোমার গোরিলাকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েছ ? তবে নিশ্চিন্ত থাক ওরা আর এ ব্যাপারে এগোবে না। এলিনর ভ্রাইসের ব্যাপারে ওদের নিউ ইয়র্ক হেড অফিস বিরক্ত হয়েছে ফলে ইলিনরকে চাকরি ছাড়তে হয়েছে। ওদের অ্যাটর্নি মেলভিন বেলিও অভিমত প্রকাশ করেছে যে এ কেস টিকবে না।
এসব খবর তুমি পেলে কোথায় উইণ্ডি ?
কেন ? তুমি আজকের স্যান ফ্রানসিসকো ক্রনিকল পড় নি ? এই যে আমি সঙ্গে এনেছি। এই নাও পড়।
উইণ্ডি তার ব্রিফকেস থেকে খবরের কাগজখানা বার করে দিয়ে দাগ দেওয়া অংশটা পড়তে বলে। পিটার খবরের কাগজ পড়তে থাকে আর

ইতিমধ্যে দেওয়ালে টাঙানো টাই-টাই-এর আঁকা ছবিগুলো উইণ্ডি দেখতে থাকে।

পিটারের কাগজ পড়া শেষ হলে উইণ্ডি তাকে জিজ্ঞাসা করে, টাই-টাই কি এখনও ছবি আঁকছে?

হ্যাঁ আঁকছে বই কি।

এই ছবিগুলোর অর্থ কি? তোমরা কিছু বুঝছ?

পিটার এই প্রশ্নের উত্তর দিল না, নীরব রইল। তারা যা অনুমান করছে তা এখন প্রকাশ করা ঠিক হবে না। সে বলল,

না উইণ্ডি, আমরা এখনও কিছু ধরতে পারি নি।

ছবিগুলি দেখে আর কেউ হয়তো ছবির অর্থ বুঝতে পেরেছে কারণ আমি শুনলাম সে নাকি টাই-টাইকে কিনতে চায়।

টাই-টাইকে কিনতে চায়? কে?

তুমি তখন অফিসে ছিলে না। লস এঞ্জেলস থেকে আমার এক অল্প পরিচিত বন্ধু আমাকে ফোন করেছিল। তার এক মক্কেল টাই-টাইকে কিনতে চায়। এজন্যে দেড়লাখ ডলার পর্যন্ত দাম দিতে রাজি আছে।

তোমাকে মক্কেলের নাম বলেছিল?

বলেছিল হাকামিচি নামে জাপানী একজন শিল্পপতি, টোকিয়োতে তার ইলেকট্রনিকস ব্যবসা আছে। সেই অ্যাটর্নি বলেছে যে তার মক্কেল এই দাম আরও একলাখ ডলার বাড়াতে পারে। কি? বিক্রি করবে নাকি?

আমি টাই-টাই-এর মালিক নই। না, টাই-টাইকে বিক্রি করা হবে না। অ্যাটর্নি ফোন করলে তুমি জানিয়ে দিতে পার।

সারা জনসন নামে সেই মেয়েটি যে কঙ্গোর প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে খোঁজখবর ও পড়াশোনা করছিল সে একটা নোট পাঠাল। তার প্রেরিত নোটে এই রকম লেখা ছিল:

প্রাচীন মিশরীয়রা যারা নীল নদের তীরে বাস করতো তাদের একটা

ধারণা ছিল যে নীল নদের উৎপত্তিস্থল হলো দক্ষিণে কোনো এক বৃক্ষ-ভূমিতে। সেই বৃক্ষভূমি বা 'ল্যাণ্ড অফ্ ট্রিজ' এক রহস্যময় দেশ, বন এতো গভীর যে সূর্যের আলো অন্ধকার ভেদ করতে পারে না এমন কি সূর্য যখন মাথার ওপর তখনও না। এই গভীর বনে অদ্ভুত সব জন্তু বাস করে। এমন পশু আছে যারা অর্ধেক কালো অর্ধেক সাদা, বেঁটে বেঁটে মানুষ বাস করে যাদের লেজ আছে। চার হাজার বছরের মধ্যে এই গভীর বনে কোনো সভ্য মানুষ প্রবেশ করেছে বলে জানা নেই।

সোনা, হাতির দাঁত, মসলা এবং ক্রীতদাসের সন্ধানে আরব বণিকেরা সপ্তম শতকে পূর্ব আফ্রিকায় যাওয়া আসা করতে থাকে। তারা আসতো ব্যবসা করতে, গভীর অরণ্যে কি আছে সে সম্বন্ধে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। তারা অজানা অরণ্য অঞ্চলকে বলতো জিঞ্জ অর্থাৎ কালো মানুষের দেশ যে দেশ সম্বন্ধে অনেক গালগল্প শোনা যায় যেমন বনের মধ্যে লেজ সমেত ক্ষুদ্র মানুষ আছে, এমন পাহাড় আছে যে পাহাড়ের মাথা থেকে আগুন বেরোয়, কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আকাশ কালো করে দেয়, সারা দেহে লোম ভর্তি বিরাটাকার দৈত্য আছে যাদের নাক চ্যাপ্টা, এমন পশু আছে যারা অর্ধেক মানুষ অর্ধেক নেকড়ে। ও দেশের বাজারে মানুষের মাংস বিক্রি হয়।

এইসব কাহিনী শুনে আরবরা আর সে দেশে যাওয়ার চেষ্টা করে নি। তবে তারা এমন কাহিনীও শুনেছিল যে আফ্রিকায় সোনার পাহাড় আছে, যে পাহাড়ে খুঁড়লেই সোনা পাওয়া যায়। এমন নদী আছে যার জলস্রোতে হীরে পাওয়া যায়। পশুরা মানুষের ভাষায় কথা বলে। অরণ্যের মধ্যে কোথাও একটা সভ্যতা লুকিয়ে আছে সে রাজ্যের নাম জিঞ্জ। জিঞ্জ শহরের নাম আরও অনেকের মুখে শোনা গেছে।

এইচ রাইডার হ্যাগার্ড যিনি গত শতাব্দীতে নাটালে বড় চাকরি করতেন তিনি এইসব গালগল্প অবলম্বন করে বেশ কয়েকখানি সুখপাঠ্য উপন্যাস লিখেছেন যেমন অ্যালান কোয়াটেরমেন, কিং সলোমনস মাইনস, মেরি, শি, কুইন অফ্ সেবা ইত্যাদি।

জিঞ্জ নামে একটা শহর যে ছিল তার উল্লেখ পরেও অনেকে করেছে। ১১৮৭ শতকে মোম্বাসায় ইবন বারাতু নামে একজন আরব ব্যবসায়ী বাস করতো। সে জিঞ্জ নামে এক শহরের উল্লেখ করেছে, যে শহর গভীর অরণ্যে অবস্থিত। বাইরের জগতের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। সেই শহরের মানুষ কাফ্রো হলেও তারা প্রচুর সম্পদ ও বিলাসে বাস করতো এমন কি ক্রীতদাসরাও সোনার জড়োয়া অলংকার পরতো।

১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ জায়েদ নামে একজন পারসিক লিখেছে যে জাঞ্জিবারের হাটে মানুষের মুষ্টির সমান বড়ো একটা হীরে বিক্রি হচ্ছিল। ঐ হীরে নাকি জিঞ্জ নামে এক দেশে পাওয়া যায়।

১৩৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইবন মহম্মদ নামে আর একজন আরব লিখেছে যে তাদের দলের কেউ নাকি জিঞ্জ শহরে যাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু শোনা গেল যে শহরে যাবার রাস্তা হারিয়ে গেছে এবং শহরটি বহু পূর্বেই পরিত্যক্ত। বর্তমানে ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছু নেই। শোনা যায় সে শহরের বাড়ির দরজা জানালাগুলি অর্ধ বৃত্তাকার যেন অর্ধেক চাঁদ। বর্তমানে সেই ভাঙা শহরে লোমশ জাতিরা বাস করে, তারা ফিস ফিস করে এক অজ্ঞাত ভাষায় কথা বলে।

তারপর আফ্রিকায় এলো পোর্টুগিজরা, দুঃসাহসী অভিযাত্রী বলে যাদের খ্যাতি আছে। পোর্টুগিজরা দুঃসাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু হলেও আফ্রিকার ভেতরে প্রবেশ করা সহজ কাজ নয়। তখন স্থানীয় অনেক অধিবাসীরা ছিল নরখাদক, কঙ্গো নদী এমনই খরস্রোতা যে নৌকো চালানো যায় না, ম্যালেরিয়া, স্লিপিং সিকনেস, দুরারোগ্য পেটের ব্যাধি, ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার এবং নানা উৎপাত ও বাধা অতিক্রম করে কঙ্গোর গভীর অঞ্চলে প্রবেশ করা সোজা কথা নয়। এছাড়া হিংস্র বন্যজন্তু বিষাক্ত সাপ তো আছেই। কঙ্গোর ভেতরে প্রবেশ করতে পোর্টুগিজরাও পারে নি।

১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপটেন ব্রেনার নামে একজন ইংরেজ অভিযাত্রী দলবল নিয়ে ভেতর দিকে যাত্রা করেছিল কিন্তু সে কোনোদিনই ফিরে আসে নি। এর পর কঙ্গো দুশো বছর পর্যন্ত অজানা রয়ে গেল।

প্রথম দিকে যারা কঙ্গো অভিযানে প্রয়াসী ছিল তারা প্রায় সকলেই হারানো শহর জিঞ্জ সম্বন্ধে কমবেশি উল্লেখ করেছে। ১৬৪২ সালে জুয়ান ডিয়েগো ডি ভ্যালডেজ নামে একজন পোর্টুগিজ চিত্রশিল্পী জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করে হারানো শহর জিঞ্জের একখানা ছবি এঁকেছিলো।

তারপর দীর্ঘদিন পার হলো। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে অজানা আফ্রিকা ঘোমটা খুলতে লাগলো। রিচার্ড বারটন এবং স্পিক, লিভিং-স্টোন এবং বিশেষ করে স্ট্যানলি আফ্রিকার বহু অজ্ঞাত অঞ্চল আবিষ্কার করলো কিন্তু তারা কেউ হারানো শহর জিঞ্জ আবিষ্কার করতে পারে নি।

সারা প্রেরিত নোট পড়ে পিটার ইলিয়ট সারা জনসনকে জিজ্ঞাসা করে-ছিলো তাহলে তুমি বলতে চাইছ যে একখানা কি দুখানা ছবি পাওয়া গেলেও জিঞ্জ নামে কোনো শহর সত্যিই ছিল কি না তা বলা যায় না।

সারা জনসন বললো, কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো পাই নি।

উত্তর শুনে পিটার হতাশ হলো। ১৬৪২ সালে পাওয়া সেই ছবি তাহলে কাল্পনিক! পিটার ভাবল তাহলে আর টাই-টাইকে কি জন্যে বা কোথায় নিয়ে যাবে।

কিন্তু ১৬৪২ সালের ছবিতে আর পোর্টুগিজ শিল্পী ভ্যালডেজ অঙ্কিত সেই জিঞ্জ শহরের দরজা জানালার অর্ধ-চন্দ্রাকার ছবিতে যথেষ্ট মিল আছে এবং টাই-টাইও দরজা জানালার অর্ধ-চন্দ্রাকার ছবি এঁকেছে। এটা কি করে হয়?

সারা জনসনকে পিটার জিজ্ঞাসা করল, তাহলে তোমার বিশ্বাস যে জিঞ্জ নামে কোনো শহর ছিল না?

জিঞ্জ শহর নিশ্চয় ছিল, কোনো সন্দেহ নেই।

উত্তর কে দিল? সারা তো তার সামনে দাঁড়িয়ে। পিটার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল বেশ লম্বা একটি মেয়ে কখন ঘরে ঢুকেছে সে জানতে পারে নি, উত্তরটা সেই দিয়েছে।

মেয়েটির পরনে স্কার্ট ও গায়ে শার্ট হাতে একটি ব্রিফকেস। সেটি টেবিলের

ওপর নামিয়ে রাখতে রাখতে নিজের পরিচয় দিল,

আমার নাম ডঃ ক্যারেন রস, আমি আরিটেসা-এর ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ড থেকে আসছি। আচ্ছা এই ফটোগুলো দেখ তো।

ক্যারেন ব্রিফকেস খুলে কয়েকখানা ফটোগ্রাফ বার করে পিটারের হাতে দিল।

পিটাব, সারা এবং ঘরে আবও তু একজন যারা ছিল তারা সকলেই ছবি-গুলো দেখল। ছবি খুব স্পষ্ট নয়, ভিডিও স্ক্রীন থেকে নেওয়া ফটো। তবুও তাদের বুঝতে অসুবিধে হলো না যে ছবিগুলি অরণ্যের মধ্যে এক ভাঙা শহ... বি। তু' একখানা ছবিতে ভাঙা বাড়িব যে দরজা জানালা দেখা যাচ্ছে সেগুলো সব অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি।

স্যাটেলাইটের সাহায্যে ছবিগুলো তোলা হয়েছে? পিটার প্রশ্ন করল।

হ্যা, তুমি ঠিকই ধরেছ। মাত্র তু'তিন দিন আগে স্যাটেলাইটের সাহায্যে ছবিগুলো আমরা আফ্রিকা থেকে পেয়েছি।

তাহলে ঐ লুপ্ত শহব কোথায় তা তুমি জান?

জানি বৈকি।

তুমি তাহলে সেখানে যাচ্ছ? আজই? কখন?

করেক্ট সময় বলতে হলে আর মাত্র তু' ঘণ্টা তেইশ মিনিট পরে আমরা স্টার্ট করছি, হাত ঘড়ি দেখতে দেখতে ক্যারেন বলল।

ক্যারেন রসের কঙ্গোতে এই ছোট অভিযাত্রী দল নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য তু'টি। প্রথম উদ্দেশ্য রেন ফরেস্টে জ্যান ক্রগারের তাঁবু ও অভিযাত্রী-দলকে কে বা কারা ধ্বংস করল? গোরিলা? অপর উদ্দেশ্য টাইপ-বি-টু ব্লু ডায়মণ্ড সংগ্রহ করা। তার বিশ্বাস ঐ তুষ্প্রাপ্য হীরে ঐ জিঞ্জ শহরে পাওয়া যাবে। ঐ অঞ্চলে গোরিলা বা বানর জাতীয় কোনো পশু আছে।

এক্ষেত্রে বানর জাতীয় পশু সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ সঙ্গে রাখা ভাল। সেই সঙ্গে পোষা একটা গোরিলা থাকলে হয়তো কিছু সুবিধে হতে পারে কিন্তু কি সুবিধে তা ক্যারেন এখন বুঝতে পারছে না।

ক্যারেন অবশ্য তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে পিটারকে বলে নি।

পিটারের উদ্দেশ্য, কথা বলতে ও বুঝতে পারে অর্থাৎ টাই-টাইকে সঙ্গে নিয়ে গোরিলাদের দেশে গেলে গোরিলা জীবন সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য সে আবিষ্কার করতে পারবে এবং এই সঙ্গে জানা যাবে জিঞ্জ নামে কোনো শহর ছিল কি না। সেই শহরের বর্তমান অধিবাসীরা নাকি লোমশ প্রাণীর দল। সত্যই কি তাই? এটাও যাচাই করা যাবে। পিটারও তার মূল উদ্দেশ্যের সব কথা ক্যারেনকে বলে নি।

প্রাথমিক আলাপ আলোচনার পর ক্যারেন স্বভাবতই টাই-টাই নামে কথা বলতে পারে এমন আশ্চর্য গোরিলা টাই-টাইকে দেখতে চাইল।

তাহলে চল, একটু দূরে যেতে হবে, আমার সঙ্গে এস, পিটার বললো।

ওরা দুজনে একটা গাড়িতে উঠল। অন্য সময় হলে হেঁটে যেত কিন্তু এখন সময় নেই। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যেখানে টাই-টাইকে রাখা হয়েছে ওরা সেখানে গেল। ছোট এবং বন্ধ একটা গেটের মাথায় লেখা আছে, "ডু নট ডিস্টার্ব, পশু নিয়ে পরীক্ষা চলছে।" গেটের তালা খোলার সময়ই পিটার কিছু ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ ও দেওয়াল আঁচড়নর শব্দ শুনে বুঝতে পারল যে শ্রীমতীর মেজাজ ভাল নেই।

ভিতরে ঢোকবার আগে ক্যারেনকে পিটার সতর্ক করে দিল। বললো, মনে রেখ টাই-টাই একটা গোরিলা। গোরিলা হলেও তাদের নিজস্ব এটিকেট আছে। জোরে কথা বোলো না, হঠাৎ হাত পা নেড়ো না অন্ততঃ যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তোমাকে চিনে নেয়। যদি হাস তো দাঁত বার কোরো না কারণ অপরের দাঁত দেখলে ওরা ভয় পায়। ওর দিকে সোজাসুজি চাইবে না তাহলে তোমাকে শত্রু মনে করতে পারে। আমার কাছে দাঁড়িও না, ও হিংসে করতে পারে। ওর সঙ্গে যদি কথা বল তো কোনো অসত্য বোলো না, ওরা তা বুঝতে পারে। নির্বাক ভাষায় অর্থাৎ সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের সাহায্যে ও কথা বললেও ও আমাদের সব কথা বুঝতে পারে। এগুলো মনে রেখো নইলে তুমি ওর সঙ্গে ভাব জমাতে পারবে না। টাই-টাই তোমাকে বাতিল করে দেবে।

আব কিছু নির্দেশ দেবে ?

না, এইটুকু মেনে চললেই যথেষ্ট।

টাই-টাই-এর সামনে যেয়ে ওরা দাঁড়ালো। পিটার বললো, গুড মর্নিং টাই-টাই।

পিটারেব কণ্ঠস্বব শুনেই টাই-টাই তাব ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পিটারকে জড়িয়ে ধবে তার গালে চুমো খেল। আর একটু হলেই পিটার পড়ে যাচ্ছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে, বললো,

টাই-টাই আজ তোমার মন ভাল আছে ত ? এই দেখ আমাব বন্ধু ডঃ ক্যাবেন রস, তুমি হ্যালো বল।

তফাতে দাঁড়িয়ে ক্যাবেন এতক্ষণ টাই-টাইকে লক্ষ্য করছিল। নির্বাক ভাষা সে ভালই আয়ত্ত কবেছে এবং সম্পূর্ণ পোষ মেনেছে। টাই-টাই-এব চোখে চোখ না বেখে সে বললো, হ্যালো টাই-টাই, বলে সে একটু হাসলো।

পিটারের নির্দেশ অনুসারে ক্যারেন টাই-টাই-এর চোখে চায় নি বা হাস-বাব সময় দাঁত বাব করে নি।

টাই-টাই ক্যারেনকে বেখে তাব ঘরে ঢুকে তার ছবি আঁকবাব ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে নখে রং লাগাতে লাগলো। পিটারও ক্যারেনকে সঙ্গে নিয়ে ঘবে ঢুকল। টাই-টাই ওদের অগ্রাহ্য করে ছবি আঁকতে লাগলো। হঠাৎ ছবি আঁকা বন্ধ রেখে টাই-টাই হাতে পায়ে হেঁটে ক্যারেনের কাছে এসে তার গা শুঁকলো তারপব তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। তারপর আঙুলে খানিকটা সবুজ রং নিয়ে ক্যারেনের স্কার্টে লাগিয়ে দিলো।

টাই-টাই নিজে মেয়ে। সে পিটারের প্রতি অনুরক্ত। পিটারের গার্ল ফ্রেণ্ডদের সে হিংসে করে। মেয়ে অপেক্ষা পুরুষদের সে বেশি পছন্দ করে।

ক্যারেনের স্কার্টে রং লাগিয়ে দিয়ে টাই-টাই আবার তার ইজেলের কাছে ফিরে যেয়ে পিটারকে বললো, পছন্দ করি না মেয়ে, টাই-টাই মেয়ে পছন্দ না করে, যাও তোমরা।

পিটার বলে, টাই-টাই তুমি অমন করছ কেন? মহিলার সঙ্গে আলাপ কর, ইনি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে এসেছেন।
টাই-টাই পিটারের অনুরোধে সাড়া দেয় না। ছবি আঁকবার জন্যে যে কাগজখানা ইজেলে আটকানো ছিল সেখানা টাই-টাই ছিঁড়ে ফেলে।
টাই-টাই অমন করে না, ডঃ ক্যারেন আমার চেয়েও অনেক বিদ্বান মানুষ।
পিটারের এই কথা শুনে টাই-টাই যেন লজ্জা পায়, সে যেন অন্যায় করেছে এইভাবে মাথা নুইয়ে বসে। ক্যারেন রস তাঁর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ নামিয়ে রাখে। টাই-টাই ব্যাগটা তুলে নিয়ে খুলে সব জিনিসগুলো বার করে পিটারকে বলে, টাই-টাই লিপস্টিক চায়, লিপস্টিক ভাল।
ক্যারেনকে পিটার বলে, টাই-টাই লিপস্টিক চাইছে।
তাই নাকি? ক্যারেন হাসে। টাই-টাই-এর সঙ্গে ভাব জমাবার একটা সুযোগ ছিল। ব্যাগেব ভেতরেই লিপস্টিক ছিল কিন্তু টাই-টাই তা বার করতে পাবে নি। ক্যারেন লিপস্টিক বার করে টাই-টাই-এর সামনে রাখে।
টাই-টাই লিপস্টিক পেয়ে খুশি হয়। লিপস্টিকের ওপরের ঢাকা খুলে সে আয়নায় সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ঠোঁটে মোটা করে লিপস্টিক লাগায়। ঠোঁটে লাগাবার পর দাঁতেও খানিকটা লিপস্টিক লাগায়।
টাই-টাই কৌতুক অনুভব করে। তার মেজাজ ফিরে আসে। পিটার তাকে বলে, আমরা বেড়াতে যাব, টাই-টাই বেড়াতে যাবে।
টাই-টাই বেড়াতে ভালবাসে। পিটার তাকে তার গাড়িতে বসিয়ে মাঝে মাঝে অনেক দূর পর্যন্ত বেড়িয়ে আনে, পথে কোথাও গাড়ি থামিয়ে পিটার ওকে অরেঞ্জ স্কোয়াস খাওয়ায়। টাই-টাই বোতলে স্ট্র রেখে চুষে চুষে অরেঞ্জ খায়। অরেঞ্জ টানবার সময় যে শব্দ হয়, সেই শব্দ শুনে মজা অনুভব করে।
বেড়াবার প্রস্তাবে টাই-টাই উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে 'কার ট্রিপ?'
না, গাড়িতে নয়, আমরা অনেক দূরে যাব। অনেক দিন বাইরে থাকব।
আমার ঘর ছেড়ে যাব? টাই-টাই বলে।

হ্যাঁ।

টাই-টাই-এর উৎসাহ যেন কমে যায়। ঘর ছেড়ে কোথায় যাবে ? একবার তাকে ঘর ছেড়ে হাসপাতালে কয়েক দিন থাকতে হয়েছিল। তার নিউ-মোনিয়া হয়েছিল। হাসপাতালে থাকা তার পছন্দ হয় নি। আবার হাসপাতালে যেতে হবে নাকি ? তাই জিজ্ঞাসা করে,

বেড়াবো কোথায় যাব কোথায় ?

আমরা অনেক দূরে যাব, বনে যাব।

টাই-টাই কোনো সাড়া দেয় না। ডান হাত তুলে একটা আঙুল নাড়তে নাড়তে কি যেন ভাবে। কিছুক্ষণ পরে বলে, বনে যাব বনে, টাই-টাই ছেঁড়া কাগজগুলো তুলে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে জড়ো করে। ক্যারেনকে পিটার বলে টাই-টাই আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছে।

ক্যারেন মনে মনে খুশি হয়। তার ভয় ছিল হাকামিচি ও তার কনসরটিয়-মকে। হাকামিচি বুঝি টাই-টাইকে মোটা দামে কিনে নিতে চেয়েছে, আড়াই লাখ ডলার পর্যন্ত দাম দিতে চেয়েছে। পিটারকেও হয়তো কিনে নিতে পারে। যাক এখন সে নিশ্চিন্ত। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পিটার টাই-টাইকে নিয়ে প্লেনে উঠবে।

এয়ারপোর্টে বিরাট-৭৪৭ কারগো জেট বিমান মাল বোঝাই প্রায় শেষ। এঞ্জিন চালু করা হয়েছে। পিটার তখনও টাই-টাইকে নিয়ে বিমানে ওঠে নি। বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। এখন রাত্রি ন'টা, এয়ারপোর্টে আলোর বন্যা বইছে। জেট এঞ্জিনের আওয়াজ টাই-টাই-এর পছন্দ নয়। সে তার নির্বাক সাংকেতিক ভাষায় জানিয়ে দিল, পাখিটা বড় আওয়াজ করে। সে কানে আঙুল দিল।

টাই-টাই-এর জন্যে বিশেষ একটা অ্যালুমিনিয়মের তৈরি ট্র্যাভেল কেজ, খেলনা, নানারকম সাজসরঞ্জাম ও প্রচুর ভিটামিন ট্যাবলেট নেওয়া হয়েছে। টাই-টাই আগে কখনও বিমানে ভ্রমণ করে নি এবং এত কাছে থেকে কখনও

বিমান দেখেনি। ব্যাপার-স্যাপার দেখে সে হকচকিয়ে গিয়েছিল। পিটারকে সে বলল, গাড়ি চড়ে যাব।

অনেক দূর আমরা উড়ে যাব, গাড়িতে সেখানে যাওয়া যায় না।

যাব কোথায়?

আমরা তো জঙ্গলে যাচ্ছি।

সেই লিপস্টিক মেয়ে কোথায়?

ক্যারেন তখন বিমানের ভেতর উঠে সব কিছু তদারক করছিল। টাই-টাইকে নিয়ে পিটারও বিমানে উঠল। বিমানের ভেতর ঢুকে দেখল বিরাট আয়োজন। বিমানখানা আরিটেসা-এর নিজস্ব, ইউস্টন থেকে স্যানফ্রানসিসকো এয়ারপোর্টে ওকে আনা হয়েছে।

বাইরে থেকে বিমানখানা যত বড় মনে হয়েছিল ভেতরে ঢুকে পিটার দেখল বিমান তারচেয়ে অনেক বড়। মালপত্তর রাখবার জায়গায় অর্থাৎ কার্গো-হোল্ড-এর দেওয়ালে লাগানো বেতার টেলিফোনে ক্যাবেন কার সঙ্গে কথা বলছিল। বাইরের আওয়াজ যাতে কানে না ঢোকে সেজন্যে সে হাত দিয়ে একটা কান চেপে কথা বলছিল।

কথা শেষ করে সে পিটারের কাছে এসে বললো, চল তোমাদের একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনি, এইটে হলো মেন কার্গো-হোল্ড। পিটার সবিস্ময়ে দেখল সেখানে রয়েছে চার চাকার একটা ট্রাক, ল্যাণ্ডরোভার এবং জলে ও ডাঙায় চলে এমন উভচর যান, রবারের ভাঁজ করা নৌকো, প্রচুর বস্ত্র সম্ভার এবং অন্যান্য সরঞ্জাম যথা টিনে-ভর্তি খাবার, কতরকম যন্ত্র ইত্যাদি। প্রত্যেকটি যানের গায়ে এবং প্যাকিং কেসগুলিতে কমপিউটারের কোড নম্বর দেওয়া আছে।

ক্যাবেন বললো, পৃথিবীর যে-কোনো স্থানে অভিযানের জন্যে আমরা সব সময়ে প্রস্তুত থাকি। এক ঘণ্টা সময় পেলেই আমরা বিমানে মাল তুলে দিতে পারি। কারণ বর্তমানে এটি একটি ব্যবসা, আরিটেসা-এর মতো আরও কয়েকটা কোম্পানি আমাদের মতো অনুরূপ কাজে আমাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

পিটার লক্ষ্য করল কার্গো-হোল্ড-এর অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে পোর্টে-বল কমপিউটার, কতকগুলি অ্যালুমিনিয়মের আধারে লেখা রয়েছে সি-থ্রি-আই।

পিটার জিজ্ঞাসা করল, এগুলি কি?

ওগুলি অত্যন্ত দামী ইলেকট্রনিক যন্ত্র বার্তা আদান-প্রদানে ব্যবহৃত হয়, সি-থ্রি-আই অক্ষরগুলির অর্থ হলো কমাণ্ড কণ্ট্রোল কমিউকিকেশনস অ্যাণ্ড ইনটেলিজেন্স।

টাই-টাই সব লক্ষ্য করছে, সে একটুও ঘাবড়ে যায় নি বরঞ্চ মনে হচ্ছে তার ভালই লাগছে। যন্ত্রপাতির সঙ্গে তার পরিচয় আছে। কমপিউটার সে চেনে। ইউনিভারসিটিতে তাকে কমপিউটারের বোতাম টিপতে দেওয়া হয় অবশ্য তারই বিষয় কিছু পরীক্ষার জন্যে। এক সময়ে সে তার সাংকে-তিক বার্তায় বললও, সুন্দর ঘর।

এখানে দু'জন দাড়িওয়ালা যুবক ছিল। একজন বললো তার নাম জেনসেন, সে জিওলজিস্ট। অপরজন বললো তার নাম আরভিং লেভিন, সে হলো ট্রিপল 'ই' অর্থাৎ এক্সপিডিশন ইলেকট্রনিক এক্সপার্ট।

ইউস্টনে আরিটেসা-এর হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্যে এবং ছবি পাঠাবার জন্যে সবরকম যন্ত্রপাতি, কমপিউটার, মিনি কমপিউটার এবং পোর্টেবল টাইপরাইটারের মতো পোর্টেবল কমপিউটারও সঙ্গে নেওয়া হয়েছে।

টাইটাই-এর জন্যেও পিটার সবকিছু গুছিয়ে নিয়েছে। তার জন্যে প্রচুর কলা নেওয়া হয়েছে। কলার মধ্যে ভিটামিন ট্যাবলেট ঢুকিয়ে তাকে খাওয়ান হয়. সে প্লেনের বাংকে শুতে পারবে না, গোরিলারা এভাবে শুয়ে ঘুমোতে পাবে না, তারা প্রতিদিন নিজের বিছানা তৈরি করে ঘুমোয় এজন্যে অনেক কম্বল নেওয়া হয়েছে। টাই-টাই নিজেই কম্বল দিয়ে তার বেড তৈরি করে মেঝেতে শোবে।

আরভিং ও জেনসেনের সঙ্গেও টাই-টাই-এর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। ক্যারেন একবার জিজ্ঞাসা করলো আমাদের প্লেন তো এখন পাঁচ হাজার

ফুট উচ্চতায় চলছে, এই উচ্চতায় টাই-টাই এর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?

পিটার বললো, টাই-টাই হলো মাউন্টেন গোরিলা, এরা পাঁচ থেকে নয় হাজার ফুট উচ্চতায় বাস করে, উচ্চতার সঙ্গে ওরা অভ্যস্ত তবে প্লেনে ওকে প্রচুর জল খাওয়াতে হবে কারণ বার্কলেতে যেখানে টাই-টাই বড় হয়েছে সেখানকার আবহাওয়া স্যাঁতসেঁতে কিন্তু প্লেনেব ভেতরের হাওয়া একেবারে শুষ্ক, এজন্যে ওকে প্রচুর পরিমাণে জল না খাওয়ালে ও অসুস্থ হয়ে পড়বে।

প্লেনে ওঠার পর থেকে টাই-টাই-এর মেজাজ ভাল হয়েছে। সে হলো বন্যজন্তু, বার্কলেতে তাকে ধরাবাঁধা নিয়মে থাকতে হতো। তার ভাল লাগতো না, মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করতো। প্লেনে উঠে সে অনেক স্বাধীনতা পাচ্ছে এবং কঙ্গোয় বাপের বাড়ি যেয়ে অবাধ স্বাধীনতা পাবে। সে খুশি।

শিক্ষণ প্রাপ্ত একটি পশুকে নিয়ে তাদেরই দেশে অভিযানে যাওয়া হচ্ছে, এমন দৃষ্টান্ত আর নেই। কঙ্গোয় যেসব গোরিলা আছে তাদের সঙ্গে টাই-টাই কি রকম ব্যবহার করবে এই হলো পিটারের দুশ্চিন্তা। চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেয়ে টাই-টাইকে অন্য গোরিলা দেখানো হয়েছিল। টাই টাই সাংকেতিক ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছিল, কিন্তু চিড়িয়াখানার গোরিলা কোনো সাড়া দেয় নি। টাই-টাই বলেছিলো, ওটা একটা মূর্খ গোরিলা।

রাত্রি এগারোটার সময় স্যান ফ্রানসিসকো থেকে আরিটেসার কার্গো প্লেন ছেড়েছিল।

প্লেন টেক-অফ করবার সময় এঞ্জিনের আওয়াজ তীব্র হবে, টাই-টাই ভয় পেতে পারে এজন্যে তাকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে পিটার ইলিয়ট থোরেলান নামে একরকম ট্র্যাংকুইলাইজারের ইঞ্জেকশন তৈরি রেখেছিল। কিন্তু টাই-টাই-এর ব্যবহারে পিটার চমৎকৃত। সে একটুও ঘাবড়ায় নি বরঞ্চ অন্য যাত্রীদের দেখাদেখি সে নিজেই সিট-বেল্ট বেঁধে নিয়েছিলো।

প্লেন যখন বেশ খানিকটা ওপরে উঠল তখন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে টাই-টাই ভয় পেয়ে গেল, সাংকেতিক ভাষায় সে পিটারকে জিজ্ঞাসা করলো, জমি কোথায় জমি কোথায় ? কারণ বাইরে তো তখন অন্ধকার। জমি কেন কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

পিটার আশংকা করলো, টাই-টাই এবার ঘাবড়ে যাবে। টাই-টাই ভয় পেয়েছে। সে আর অপেক্ষা না করে টাই-টাইকে থোবেলান ইঞ্জেকশন দিয়ে দিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে টাই-টাই শান্ত হয়ে দেখল যাত্রীরা কিছু পান করছে। সেও সঙ্গে সঙ্গে এক বোতল পানীয় এবং একটা সিগারেট চাইল। যাত্রীরা হালকা সুরা পান করছিল। টাই-টাইকেও এক বোতল দেওয়া হল সেই সঙ্গে সিগারেট। সিগারেটটা পিটার ধরিয়ে ওর হাতে দিল। পিটার তার মাথা চুলকে দিতে লাগল। বানর জাতীয় জীবরা দিনের মধ্যে কিছু সময় পরস্পর মাথা বা দেহ থেকে উকুন বা অন্য পোকা বাছে। এর-দ্বারা ওদের দলগত একতা বাড়ে। পরস্পরের প্রতি ওদের সহানুভূতিও জন্মায়। তাই পিটার প্রত্যহ টাই-টাই-এর মাথায় বিলি কাটে।

টাই-টাই আরাম বোধ করল, সে বলল, টাই-টাই এবার ঘুমোবে, বলে সিট থেকে নিজেই নেমে তার শোবার স্থানে যেয়ে কম্বল নিয়ে শয্যা তৈরি করে শুয়ে পড়লো। কয়েক মিনিট পরেই তার নাসিকা গর্জন করতে লাগলো।

অভিযাত্রী দলটি ক্ষুদ্র কিন্তু অভিযানের বিরাট আয়োজন দেখে পিটার অবাক হয়েছিল। অতি আধুনিক নানারকম যন্ত্রপাতি সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। এ যেন একটা চন্দ্রাভিযান। তার সন্দেহ হলো আর্থ রিসোরসেস টেকনোলজি সারভিসের সঙ্গে মিলিটারি যোগাযোগ আছে। কথাটা সে ক্যারেনকে জিজ্ঞাসাও করলো।

সত্যি করে বল তো ক্যারেন তোমাদের এই অভিযানের উদ্দেশ্য কি ? ব্লু ডায়মণ্ড আবিষ্কার করা, হারানো শহর জিঞ্জ খুঁজে বার করা, নতুন করে গোরিলা চরিত্র অনুসন্ধান করা নাকি মার্কিন মিলিটারির হয়ে গুপ্তচরের কাজ করা ?

প্রশ্ন শুনে ক্যারেন হো হো করে হেসে উঠলো, বললো, আমাদের আরিটেসা অত্যন্ত সুসংগঠিত, মিলিটারির সংগঠনও আমাদের ধারে কাছে আসতে পারে না, প্রতি অভিযানেই আমরা বহু রকম সাজসরঞ্জাম নিয়ে যাই, সব হয় তো কাজে লাগে না। কিন্তু কে বলতে পারে কোনটা কাজে লাগবে না তাই আমরা যেখানেই যাই সব কিছু সম্ভাবনার জন্যে প্রস্তুত হয়েই যাই, যাচ্ছি এক দুর্গম দেশে, সেখানে আমাদের কি দরকার হবে কে বলতে পারে ?

তাহলে তোমাদের মূল উদ্দেশ্য কি ? আরিটেসা ভিরুঙ্গা অঞ্চলে কেন বার বার অভিযাত্রী দল পাঠাচ্ছে ?

বার বার তো নয়, একটা ছোট অভিযাত্রী দল গিয়েছিল, সেটা এক রহস্য-জনক পরিস্থিতিতে ধ্বংস হয়েছে। সেই রহস্যজনক পরিস্থিতি বা কারণটা কি সেটা জানা এবং ঐ অভিযাত্রী দলের অসমাপ্ত কাজ শেষ করাই আমাদের লক্ষ্য। টাই-টাই একটা হারানো শহর তার স্বপ্নে দেখেছে, সে কিছু ছবিও এঁকেছে, আমরাও বিশ্বাস করি ভিরুঙ্গার রেন ফরেস্টের মধ্যে কোথাও সেই হারানো শহর আছে যার নাম জিঞ্জ।

এই হারানো শহরের অস্তিত্ব কোনো কোনো মানুষ কয়েক শতাব্দী থেকে বিশ্বাস করে আসছে। গত তিনশত বৎসরের মধ্যে ঐ শহরে পৌঁছবার কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছে।

১৬৯২ সালে জন মারলে নামে একজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী দুশো জন লোক নিয়ে কঙ্গোর রেন ফরেস্টে প্রবেশ করে কিন্তু সে আর ফিরে আসে নি। তাদের কোনো খবরও পাওয়া যায় নি। ১৭৪৪ সালে একটা ডাচ অভিযাত্রী দল এবং ১৮০৪ সালে স্কটল্যাণ্ডের এক অভিজাত পরিবারের সন্তান স্যার জেমস ট্যাগের্ট-এর অধীনে আর একটি ব্রিটিশ অভিযাত্রী

প্লেন যখন বেশ খানিকটা ওপরে উঠল তখন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে টাই-টাই ভয় পেয়ে গেল, সাংকেতিক ভাষায় সে পিটারকে জিজ্ঞাসা করলো, জমি কোথায় জমি কোথায় ? কারণ বাইরে তো তখন অন্ধকার। জমি কেন কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

পিটার আশংকা করলো, টাই-টাই এবার ঘাবড়ে যাবে। টাই-টাই ভয় পেয়েছে। সে আর অপেক্ষা না করে টাই-টাইকে থোবেলান ইঞ্জেকশন দিয়ে দিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে টাই-টাই শান্ত হয়ে দেখল যাত্রীরা কিছু পান করছে। সেও সঙ্গে সঙ্গে এক বোতল পানীয় এবং একটা সিগারেট চাইল। যাত্রীরা হালকা সুরা পান করছিল। টাই-টাইকেও এক বোতল দেওয়া হল সেই সঙ্গে সিগারেট। সিগারেটটা পিটার ধরিয়ে ওর হাতে দিল। পিটার তার মাথা চুলকে দিতে লাগল। বানর জাতীয় জীবরা দিনের মধ্যে কিছু সময় পরস্পর মাথা বা দেহ থেকে উকুন বা অন্য পোকা বাছে। এর-দ্বারা ওদের দলগত একতা বাড়ে। পরস্পরের প্রতি ওদের সহানুভূতিও জন্মায়। তাই পিটার প্রত্যহ টাই-টাই-এর মাথায় বিলি কাটে।

টাই-টাই আরাম বোধ করল, সে বলল, টাই-টাই এবার ঘুমোবে, বলে সিট থেকে নিজেই নেমে তার শোবার স্থানে যেয়ে কম্বল নিয়ে শয্যা তৈরি করে শুয়ে পড়লো। কয়েক মিনিট পরেই তার নাসিকা গর্জন করতে লাগলো।

অভিযাত্রী দলটি ক্ষুদ্র কিন্তু অভিযানের বিরাট আয়োজন দেখে পিটার অবাক হয়েছিল। অতি আধুনিক নানারকম যন্ত্রপাতি সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। এ যেন একটা চন্দ্রাভিযান। তার সন্দেহ হলো আর্থ রিসোরসেস টেকনোলজি সারভিসের সঙ্গে মিলিটারি যোগাযোগ আছে। কথাটা সে ক্যারেনকে জিজ্ঞাসাও করলো।

সত্যি করে বল তো ক্যারেন তোমাদের এই অভিযানের উদ্দেশ্য কি? ব্লু ডায়মণ্ড আবিষ্কার করা, হারানো শহর জিঞ্জ খুঁজে বার করা, নতুন করে গোরিলা চরিত্র অনুসন্ধান করা নাকি মার্কিন মিলিটারির হয়ে গুপ্তচরের কাজ করা?

প্রশ্ন শুনে ক্যারেন হো হো করে হেসে উঠলো, বললো, আমাদের আরিটেসা অত্যন্ত সুসংগঠিত, মিলিটারির সংগঠনও আমাদের ধারে কাছে আসতে পারে না, প্রতি অভিযানেই আমরা বহু রকম সাজসরঞ্জাম নিয়ে যাই, সব হয় তো কাজে লাগে না। কিন্তু কে বলতে পারে কোন্‌টা কাজে লাগবে না তাই আমরা যেখানেই যাই সব কিছু সম্ভাবনার জন্যে প্রস্তুত হয়েই যাই, যাচ্ছি এক দুর্গম দেশে, সেখানে আমাদের কি দরকার হবে কে বলতে পারে?

তাহলে তোমাদের মূল উদ্দেশ্য কি? আরিটেসা ভিরুঙ্গা অঞ্চলে কেন বার বার অভিযাত্রী দল পাঠাচ্ছে?

বার বার তো নয়, একটা ছোট অভিযাত্রী দল গিয়েছিল, সেটা এক রহস্য-জনক পরিস্থিতিতে ধ্বংস হয়েছে। সেই রহস্যজনক পরিস্থিতি বা কারণটা কি সেটা জানা এবং ঐ অভিযাত্রী দলের অসমাপ্ত কাজ শেষ করাই আমাদের লক্ষ্য। টাই-টাই একটা হারানো শহর তার স্বপ্নে দেখেছে, সে কিছু ছবিও এঁকেছে, আমরাও বিশ্বাস করি ভিরুঙ্গার রেন ফরেস্টের মধ্যে কোথাও সেই হারানো শহর আছে যার নাম জিঞ্জ।

এই হারানো শহরের অস্তিত্ব কোনো কোনো মানুষ কয়েক শতাব্দী থেকে বিশ্বাস করে আসছে। গত তিনশত বৎসরের মধ্যে ঐ শহরে পৌঁছবার কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছে।

১৬৯২ সালে জন মারলে নামে একজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী দুশো জন লোক নিয়ে কঙ্গোর রেন ফরেস্টে প্রবেশ করে কিন্তু সে আর ফিরে আসে নি। তাদের কোনো খবরও পাওয়া যায় নি। ১৭৪৪ সালে একটা ডাচ অভিযাত্রী দল এবং ১৮০৪ সালে স্কটল্যাণ্ডের এক অভিজাত পরিবারের সন্তান স্যার জেমস ট্যাগের্ট-এর অধীনে আর একটি ব্রিটিশ অভিযাত্রী

দল রেন ফরেস্টে প্রবেশ করেছিল।

ট্যাগের্ট উত্তর দিক থেকে ভিরুঙ্গায় ঢুকেছিলো এবং উবাঙ্গি নদীর রবানা বাঁক পর্যন্ত গিয়েছিলো। সেখান থেকে সে দক্ষিণ দিকে একটি অগ্রগামী দল পাঠায় কিন্তু গভীর বন তাদের গ্রাস করে।

১৮৭২ সালে সেই বিখ্যাত স্ট্যানলি ভিরুঙ্গার পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলো কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করে নি। ১৮৯৯ সালে একটি জার্মান দল গিয়েছিলো কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। বনের গভীরে প্রবেশ করার আগেই অর্ধেক লোক মারা পড়েছিল। ১৯১১ সালে ইটালি থেকে একটি অভিযাত্রী দল গিয়েছিলো কিন্তু অরণ্য তাদের গ্রাস করে, কেউ ফেরে নি।

এর পর হারানো শহর জিঞ্জ অভিযানে আর কেউ যায় নি, মন্তব্য করে ক্যাবেন বস।

পিটার বলে তাহলে সেই শহর কেউ খুঁজে পায় নি।

মাথা নেড়ে ক্যারেন বলে, আমার মনে হয় তা ঠিক নয়। কোনো না কোনো অভিযাত্রীদল সেই শহরে পৌঁছেছিল কিন্তু বিরাট বাধা অতিক্রম করে ফিরে আসতে পারে নি।

অতীতে আফ্রিকার ভেতরে অভিযান চালানো ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। সুসংবদ্ধ অভিযানেও বহু লোক মারা পড়ত। ম্যালেরিয়া, ব্ল্যাক ওয়াটাব ফিভাব, স্লিপিং সিকনেসের হাত থেকে যারা অব্যাহতি পেতো তাবা হয়তো খরস্রোতা নদীতে কুমিরের পেটে যেত বা বনে প্রবেশ করে বাঘ, সাপ, হিংস্র প্রাণী বা নরখাদকদের শিকার হতো। অরণ্য নানারকম গাছপালায় পূর্ণ হলেও সে বন থেকে কোনো আহার্য বা জল পাওয়া যেত না ফলে অনাহারে ও তৃষ্ণায় কত মানুষ প্রাণ দিয়েছে।

ক্যারেন রস বললো, আমি ধরেই নিয়েছিলুম যে জিঞ্জ নামে একটা হারানো শহর আছে এবং কোথায় সেটা থাকতে পারে ? আমার অনুমান হলো হীরের খনির সঙ্গে ঐ শহরের সম্পর্ক আছে এবং আগ্নেয়গিরি থেকে হীরে

বেরিয়ে আসে। সেই বেরিয়ে আসা হীরে কালক্রমে মাটির তলায় চাপা পড়ে বা নদীর স্রোতে ভেসে যায়।

ভিরুঙ্গা অঞ্চলে তিনটে ভলক্যানো আছে যারা আজও মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। এরা হলো মুকেংকো, নুবুটি, কানাগারাবি। এদের উচ্চতা এগারো থেকে পনেরো হাজার ফুট। ক্যারেন রস তাই অনুমান করলো ভিরুঙ্গা অঞ্চলে এখনও হীরে পাওয়া যাবে বিশেষ করে তারা ইলেকট্রনিকস যন্ত্রে ব্যবহারের জন্যে যে টাইপ টু-বি ব্লু ডায়মণ্ডের খোঁজ করছে। এই হীরে অলংকারে ব্যবহৃত হয় না।

ক্যারেন রস বলতে লাগলো, বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। পৃথিবীতে বসে চাঁদ তথা অন্যান্য গ্রহের বিষয় জানা যাচ্ছে অতএব পৃথিবীতে বসে পৃথিবীর খবর কেন পাওয়া যাবে না? আকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন করার ফলে টেলিভিসনের পাল্লা অনেক বেড়ে গেছে এছাড়া এমন সব সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যে সেই সব যন্ত্রের সাহায্যে বিমানের ল্যাবরেটারিতে বসে অন্য দেশের অনেক খবর সংগ্রহ করা যায় এমন কি দূরদূরান্তের ফটোও তোলা যায়। আমরা কি জানতে পেরেছি তা তোমাকে আমার পোর্টেবল কমপিউটার বা কনসোলের সাহায্যে দেখাচ্ছি।

ক্যারেনের কনসোলটি যেন ছোট একটি রেডার যন্ত্র। তার একটা ছোট পর্দা আছে। সেই পর্দায় ছবি ফুটে ওঠে। স্যাটেলাইট মাধ্যমে ক্যারেন রস ভিরুঙ্গার বিস্তৃত অঞ্চলের ছবি তুলেছিল। বোতাম টিপে পর্দায় ছবি ফুটিয়ে পিটারকে ক্যারেন দেখাতে লাগল নদীতে প্রথমে হীরে পাওয়া গেল, সেই হীরের উৎস সন্ধানে নদীর উজানে যেতে যেতে অভিযাত্রীরা এমন এক পাহাড়ের গায়ে পৌঁছল যেখানে এই হীরে রয়েছে। পাহাড়ের গায়ে হীরে এসেছে ভলক্যানো থেকে।

তোমরা তাহলে অভিযাত্রী দল পাঠিয়েছিলে? হীরের সন্ধানে না জিঞ্জ শহরের সন্ধানে?

দুটোরই সন্ধানে। আমাদের অভিযাত্রী দল জিঞ্জ শহরের সন্ধানও পেয়েছিল তবে ওরা শহরে পৌঁছতে পারে নি কিন্তু আমি স্যাটেলাইট মাধ্যমে

যে সব ছবি তুলেছি তার দ্বারা আমি জিঞ্জ শহরের অস্তিত্ব টের পেয়েছি।
রেন ফরেস্ট এতই গভীর যে তা ভেদ করে কোনো ছবি তোলা সম্ভব নয়। ভেতরে কি আছে তা ওপর থেকে কিছুই দেখা যায় না এমন কি বনের ভেতরে ষাট থেকে একশ ফুট চওড়া যেসব নদী আছে তাও দেখা যায় না ওপর থেকে। ঋতুভেদে এই অঞ্চলের বনের কোনো পরিবর্তন হয় না। পাতা ঝরে না। পাতার রং বদলায় না। সারা বছর একই রকম।
কিন্তু মানুষকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। বনের ভেতরে যদি শহরের পত্তন হয়ে থাকে তাহলে সেখানে নিশ্চয় বন কাটা হয়েছিল। বন কাটবার পর সেই অঞ্চলে পরে অন্য ধরনের গাছ জন্মায়।
রেন ফরেস্টে প্রধানত আছে মজবুত গুঁড়ির গাছ যেমন মেহগনি, সেগুন এবং ইবনি আর নিচে আছে ফার্ন, পাম। এই বনের মাটি সূর্যের আলো পায় না তবে এই বনে বিচরণ করা যায়।
এই বন বা অংশ মানুষ যদি কাটে এবং পরে তা পরিত্যাগ করে চলে যায় তখন সেখানে অন্য ধরনের গাছ জন্মায় দ্রুত এবং তাদের গুঁড়ি বেশি মজবুত নয়। এছাড়া জন্মায় বাঁশ ও কাঁটাওয়ালা লতা ও গুল্ম।
ছবি তুললে এই দুই ধরনের গাছের পার্থক্য বোঝা যাবে। নদীর ধারে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের বন দেখা যায়। জলের জন্যই মানুষ এই দ্বিতীয় পর্যায়ের বন সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। ছবি তুললে এই দুই ধরন বনের পার্থক্য বোঝা যায় তবে এজন্যে অনেক ছবি তুলতে হয়।
স্যাটেলাইটের মাধ্যমে অনেক ছবি তুলতে তুলতে ইকোয়েটরের দু ডিগ্রি উত্তরে আর তিরিশ ডিগ্রি লঙ্গিচিউডে মুকেংকো ভলক্যানোর পাহাড়ের পশ্চিম গায়ে নতুন এক বনের সন্ধান পাওয়া গেল। এই বনের বয়সও নিরুপণ করা গেল, পাঁচশ থেকে আটশ বছর।
পিটার জিজ্ঞাসা করল, অতএব এই বন বা বনের মধ্যে মানুষের বসতি আছে বা ছিল কিনা জানবার জন্যে তোমরা একটা অভিযাত্রী দল পাঠালে?
জ্যান ক্রুগার নামে একজন সাউথ আফ্রিকানের পরিচালনায় আমরা একটা অভিযাত্রী দল পাঠাই। সেই দল তিন সপ্তাহ আগে রিপোর্ট পাঠায় যে

কাছেই নদীতে ব্লু ডায়মণ্ড পাওয়া গেছে এখন তারা তার উৎস সন্ধানে এগিয়ে যেয়ে একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরে পৌছেছে।
তারপর কি ঘটল? পিটার জিজ্ঞাসা করলো।

ক্রগারের ক্যাম্প ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভিডিও টেপের সেই ছবি পিটারকে দেখানো হলো। সেই পুড়ে যাওয়া তাঁবু, কয়েকটা লাশ, আগুন এবং সর্বশেষে ক্যামেরার সামনে বিরাট একটা মুখ যা গোরিলার মুখ বলে মনে হয়েছে।
পিটার ইলিয়ট মুখখানা খুব ভাল করে দেখল, একবার নয়, কয়েকবার। গোরিলার মুখ বা দেহ আরও কালো হওয়া উচিত কিন্তু এ মুখের রং অনেক হালকা, ব্ল্যাক না বলে গ্রে বলা যায়।
পিটার ইলিয়ট মন্তব্য করলো, গোরিলারা শান্তিপ্রিয় নিরামিষভোজী জীব তারা মানুষের মাথা এইভাবে ভেঙে কখনও হত্যা করে না। তাছাড়া গোরিলার রং কালো কিন্তু এ মুখ ধূসর অথচ গোরিলা নয় বলেও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাহলে কি এটা নতুন কোনো প্রজাতির গোরিলা যার বিষয় তারা জানে না? হিংস্র ও ধূসর রঙের এমন এক প্রজাতির গোরিলা তারা আবিষ্কার করতে চলেছে যাদের বিষয় এখনও প্রাণি-বিজ্ঞানের কোনো বইয়ে লেখা হয় নি? পিটার ভাবছে সে এই অভিযানে এসেছে টাই-টাই-এর স্বপ্ন ও আঁকা ছবি যাচাই করতে তার পরিবর্তে সে কি এক অজ্ঞাত প্রজাতির গোরিলা আবিষ্কার করবে?
পিটার ইলিয়ট সঙ্গে গোরিলাদের সম্বন্ধে কয়েকখানা বই ও ফিল্ম এনেছিল। সে ক্যারেন রসকে বললো, গোরিলা ফিল্মগুলো সে এখনি দেখতে চায়, ব্যবস্থা করে দিতে। এ ব্যবস্থা করতে মাত্র কয়েক মিনিট লাগলো। ফিল্মগুলোও দীর্ঘ নয়, প্রতিটি সাত বা আটশো ফুট।
পিটার ফিল্মগুলি ভাল করে দেখলো, বইয়ের পাতা ওলটালো তারপর কিছু নোট নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। ভিডিও টেপ-এ দেখা গোরি-

তার মুখ এবং তার কিছু গতি দেখে সে জীবটাকে বাতিল করতে পারছে না। ক্রমশঃ তার বিশ্বাস জন্মালো যে জীবটা গোরিলা কিন্তু তার রং ও স্বভাবের সঙ্গে সে অপরিচিত।
সে যদি জিঞ্জ শহরে পৌঁছতে পারে এবং এই প্রজাতি গোরিলার সাক্ষাৎ পায় তাহলে সে এক নতুন গৌরবের অধিকারী হবে।

সেভেন ফোর সেভেন জেট প্লেনটার এক কোণে ফাইবার গ্লাসের সাউণ্ড প্রুফ একটা ঘর আছে। ক্যারেন রস তার নাম দিয়েছে কফিন। ছোট্ট ঘর, টেলিফোন বুথের চেয়ে একটু বড়। এই ঘরে আছে শক্তিশালী একটা ট্রান্সমিটার।
প্লেন তখন চলছে আটলানটিকের মাঝামাঝি সমুদ্রের ওপর। কফিনে ঢোকবার আগে দেখল পিটার এবং টাই-টাই দু'জনেই ঘুমোচ্ছে, দুজনে-রই নাক ডাকছে। ক্যারেনের চোখে ঘুম নেই। কয়েকটা কারণে সে চিন্তিত।
ইউরো-জাপান কনসরটরিয়মের খবর কি? তারা কঙ্গোর পথে কতদূর এগিয়েছে? প্লেনে ওঠবার আগে সে শুনেছিল উগাণ্ডায় যুদ্ধ বেধেছে। কঙ্গোয় প্রবেশ করতে কোনো বাধা পাবে কিনা এবং কঙ্গোয় পৌঁছে তাদের দলের ভার নেবে ও গাইডের কাজ করবে এমন একজন লোক দরকার। গত অভিযানে ছিল ক্রুগার কিন্তু এবার পাকাপাকিভাবে কোনো লোক ঠিক করা হয় নি যদিও তারা মনে মনে একজনের নাম ভেবে রেখেছে। এ লোক নাকি নির্ভরযোগ্য নয় অথচ তার তুল্য যোগ্য লোক পাওয়া কঠিন। এইগুলো নিয়ে ট্রেভিসের সঙ্গে একবার আলোচনা করা দরকার।
ওয়ারলেস টেলিফোনে যোগাযোগ হলো। ক্যারেন সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বোতাম টিপে দিল। দু'জনের কথাবার্তা টেপরেকর্ড হয়ে যাবে।
হ্যালো।

ট্রেভিসের গলা শোনা যেতেই ক্যারেন উত্তর দিল, ক্যারেন কথা বলছি, কি খবর বল, নতুন কিছু আছে ?

আছে বৈকি, খবর ভাল নয়, গত দশ ঘণ্টার মধ্যে কঙ্গোর পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে। ওয়াশিংটনে জেয়ার এমব্যাসি থেকে জানা গেল যে রবাণ্ডার ওদিকে ওরা পুব দিকের সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে কিন্তু কোনো কারণ তারা জানায় নি। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে খবর নিয়ে জানা গেল টানজানিয়া উগাণ্ডা আক্রমণ করেছে ফলে উগাণ্ডার ডিক্টেটরের সৈন্যরা ভয় পেয়ে কঙ্গোয় ঢুকে পড়েছিল, এজন্যে জেয়ার গভর্ণমেণ্ট বর্ডার সীল করে দিয়েছে।

তারপর ?

রয়টার বলছে, এই সঙ্গে জেয়ারের পুব দিকের উপজাতিরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে। পিগমিরাও ক্ষেপে গেছে, নরখাদকদের তৎপরতা বেড়েছে, ঐ অঞ্চলে কোনো আগন্তুক প্রবেশ করলে তারা তাদের হত্যা করছে। এই বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে জেয়ার সরকার জেনারেল মুগুরুকে পাঠিয়েছে।

তাহলে আমরা কোন্‌দিক দিয়ে জেয়ারে মানে কঙ্গোয় ঢুকব ?

কঙ্গোতে এখন বেআইনীভাবে প্রবেশ করা বিপজ্জনক, কেবলমাত্র পশ্চিম দিকে কিনহাসা হয়ে প্রবেশ করা যাবে। তোমরা হোয়াইট হাণ্টার মানরোর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। একমাত্র সেই তোমাদের পথ দেখিয়ে এবং কুলিদের সামলে তোমাদের ভিরুঙ্গায় নিয়ে যেতে পারে যতই তার অন্য দোষ থাকুক।

ইউরো-জাপান কনসরটিয়মের খবর কি ?

ওদের মধ্যে জাপানের হাকামিচি তো আছেই এছাড়া আছে জার্মানির জারলিখ আর অ্যামস্টার্ডামের ভুরস্টার। ওদের তিনজনের মধ্যে যে মতান্তর দেখা দিয়েছিল তা ওরা মিটিয়ে ফেলেছে। ওদেরও উদ্দেশ্য ব্লু ডায়মণ্ড। কঙ্গোয় যত ব্লু ডায়মণ্ড পাওয়া যাবে তা খনি থেকে তোলার একমাত্র অধিকার ওরা চায়। এ বিষয়ে ওরা জেয়ার সরকারের কাছে

প্রস্তাব পাঠিয়েছে। ওরাও মানরোকে চায়।
ওরা কখন বা কবে কঙ্গো পৌঁছবে ?
আমার পাকা খবর হলো আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে।
আর ট্যাঞ্জিয়ার পৌঁছবে কখন ? ক্যারেন জিজ্ঞাসা করে।
ছ ঘণ্টার মধ্যে, তোমরা কখন পৌঁছবে ?
সাত ঘণ্টা লাগবে। মানরোর কোনো খবর ?
না, মানরোর কোনো খবর আমরা জানি না তবে তোমরা কি তাকে দলে টানতে পারবে ?
যে করেই হোক তাকে দলে টানব, দরকার হয় তাকে ব্ল্যাকমেল করব ও তো বেআইনীভাবে রাইফেল পাচার করে। ওকে ভয় দেখাব আমাদের কাছে কয়েকটা চেক রাইফেল আছে যার প্রত্যেকটায় মানরোর আঙুলের ছাপ আছে। এগুলো ও নাইরোবি থেকে চুরি করে উগাণ্ডায় পাঠাবার ব্যবস্থা করছিল। এতে যদি সে ভয় না পায় তো টাকা দিয়ে ওকে বশ করব। ওজন্যে তুমি ভেবো না, শেষ পর্যন্ত ওকে যদি নাও পাই আমরা একাই যাব, আমাদের সব সরঞ্জামই তো আছে।
তোমার যাত্রীদের খবর কি ?
পিটার আর টাই-টাই দু'জনেই নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। এখন এই পর্যন্ত থাক, আমাকে ফিল্ড পার্টির মালপত্তরগুলো একবার চেক করতে হবে
আচ্ছা বাই দি বাই হাকামিচির দলটাকে কোনোরকমে বিভ্রান্ত করতে পার না ?
ভাল বলেছ তো, চেষ্টা করে দেখছি।
ক্যারেন রস লাইন ছেড়ে দেবার পর ট্রেভিস রজার্সকে ডাকল। রজার্স হলো ইলেকট্রনিকস সারভিল্যান্স এক্সপার্ট। ভিন্ন বেতার তরঙ্গে গোপনে কারা কোথা থেকে কোথায় কথা বলছে সেইসব ধরার এক্সপার্ট। আবার সে নিজে এমন চ্যানেলে বার্তা প্রচার করতে পারে যা অপরের পক্ষে ধরা দুঃসাধ্য।
রজার্স আসতে ট্রেভিস তাকে জিজ্ঞাসা করল, ইউরো-জাপানিজ কনসর

টিয়মের প্লেন এখন আটলান্টিকের কোন পজিশনে আছে খুঁজে বার কর তারপর এই মেসেজটা প্রচার করবে। আমরা যেন মেসেজটা ক্যারেন রসকে পাঠাচ্ছি। তুমি মেসেজটা এমন ওয়েভলেংথে পাঠাবে যা তাদের রেডিও অপারেটর সহজে ধরতে পারবে।

এতো খুব সহজ, মেসেজটা দিন, রজার্স বলল।

একটু অপেক্ষা কর। মেসেজটা আমি খুব সহজ একটা সাংকেতিক ভাষায় মানে কোডে লিখে দিচ্ছি যা ওদের ভাঙতে পনেরো মিনিটও লাগবে না। মেসেজটা যদি ওরা বিশ্বাস করে তাহলে ওরা বিভ্রান্ত হবে।

লস্ট সিটি জিঞ্জ সম্বন্ধে একটা গাঁজাখুরি মেসেজ লিখে ট্রেভিস সেটা রজার্সের হাতে দিয়ে বলল, এটা এখনি ব্রডকাস্ট কর, ওরা যদি মেসেজটা বিশ্বাস করে তাহলে ট্যানজিয়ারে ওরা ঠিক আটচল্লিশ ঘণ্টা বসে থাকবে।

মেসেজ নিয়ে রজার্স চলে যেতে ট্রেভিস মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলো মেসেজটা ওরা যেন বিশ্বাস করে তাহলে ওরা ট্যানজিয়ারে নিশ্চিতই আটচল্লিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করবে। আটচল্লিশ ঘণ্টা না হলেও চব্বিশ ঘণ্টাও যদি অপেক্ষা করে তাহলেআমাদের টিম আগে ভিকুঙ্গা পৌঁছে যাবে।

কারা যেন চাপা গলায় কথা বলছে। পিটারের ঘুম ভেঙে গেলেও ঘুমের জড়তা ভাঙে নি। শুয়ে শুয়েই সে শুনছে, দু'জনে কথা বলছে,

তোমার স্ক্রীনে তুমি কি দেখেছ? খারাপ কিছু?

আমার তো তাই মনে হচ্ছে।

তোমার ভুলও তো হতে পারে, হয়তো মেঘের আবরণ।

না, মেঘ নয়, মেঘের রং অত কালো হয় না।

তাহলে কি?

পিটার চোখ খুলল। ভোর হচ্ছে। দূরে নীল আকাশে লাল রেখা ফুটে উঠছে। ঘড়ি দেখল, পাঁচটা বেজে এগারো সেকেণ্ড, স্যান ফ্রানসিসকো টাইম। টাই-টাই তার কম্বলের বাসায় দিব্যি ঘুমোচ্ছে।

দু'জনের মধ্যে চাপা গলায় তখনও কথা চলছে। কমপিউটার কনসোলের সামনে দাঁড়িয়ে জেনসেন আর লেভিন কথা বলছে। একজন বললো, ডেঞ্জারাস সিগনেচার, কমপিউটার স্ক্রীনে যা দেখছি তা বিপদের ছায়া ছাড়া আর কিছু নয়।

পিটার তার বাংক থেকে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কি দেখছ? কি বিপদের ছায়া?

একটা আগ্নেয়গিরি উদ্গিরণ আরম্ভ করেছে, এখনও আগুন বা লাভা বেবোয়নি তবে ধোঁয়া বেরোতে আবম্ভ করেছে, ধোঁয়ার রং কখনও ঘোর কালো, কখনও ঘোর সবুজ।

এখানে আগ্নেয়গিরি কোথায়? পিটাব জিজ্ঞাসা করে।

এখানে নয়, অনেক দূরে, আমবা যেখানে যাচ্ছি সেখানে, ভলক্যানোটার নাম হলো মুকেংকো, ভিরুঙ্গা রেঞ্জের সজীব ভলক্যানো। তিন বছর অন্তর মুকেংকো জেগে ওঠে, ১৬৬১ সালের মার্চ মাসে মুকেংকো প্রলয় ঘটিয়েছিলো। আমার অনুমান আর এক সপ্তাহেব মধ্যে মুকেংকো আগুন জ্বালাবে।

ডঃ রস জানে?

হ্যাঁ জানে কিন্তু সে এখন অন্য চিন্তায় মগ্ন। কঙ্গোতে নাকি গোলমাল বেধেছে, এই খবর পেয়ে সে চিন্তিত। তাদের হয়তো কঙ্গোতে ঢুকতেই দেবে না। প্লেনের পিছন দিকে সে কি সব কাজ করছে। অনেকক্ষণ তাকে দেখা যায় নি।

দুটো খবরই খারাপ। পিটার উদ্বিগ্ন হলো। ক্যারেনের সন্ধানে সে প্লেনের পিছন দিকে গেল। ছোট একটা টেবিলের সামনে বসে ক্যারেন ছাপানো লিস্টে সবুজ বল পেন দিয়ে টিক মারছে।

পিটার তাকে জিজ্ঞাসা করল, খবর শুনেছ?

শুনেছি, তা বলে তো চুপ করে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। ভলক্যানো এখনোও অ্যাকটিভ হয়নি এবং আমরা এখনোও কঙ্গো থেকে অনেক দূরে। আগে তো সেখানে পৌঁছই তারপর দেখা যাবে।

তুমি কি করছো ?

আমাদের ফিল্ড পার্টির জন্যে আমরা এমন সব প্যাকেট তৈরি করেছি যা আমরা নিজেরাই বইতে পারব। দু সপ্তাহের মতো খাবার সঙ্গে নিচ্ছি। জল খুব ভারি হবে তাই জল নিচ্ছি না তবে জল শোধন করবার যন্ত্র আছে, যে-কোনো জল শোধন করা যাবে এমন কি নিজের ইউরিন পর্যন্ত, পান করবার সময় কিছুই টের পাওয়া যাবে না।

একটা সানগ্ল্যাস ছিল, দেখতে একটু অন্যরকম, কাঁচ পুরু ও রং ঘোর, ফ্রেমের মাঝখানে ব্রিজের ওপর একটা লেনস্ বসানো রয়েছে। পিটার সেটা তুলে নিতেই ক্যারেন বলল, ওটা হলো হলোগ্রাফিক নাইট গগল্। এই চশমার অনেক গুণ আছে। এছাড়া আরও কতরকম ছোটবড় যন্ত্রপাতি রয়েছে যেমন ক্যামেরা তবে সাধারণ নয়, মিনিয়েচার লেসার বিম যন্ত্র। কয়েকটা ট্রাইপড রয়েছে তাতে মোটর লাগানো আছে। এই ট্রাইপডে কোনো যন্ত্র রাখা যাবে কিন্তু কি যন্ত্র লাগানো যাবে ক্যারেন তা বললো না। সে শুধু বললো আত্মরক্ষার জন্যে এই ট্রাইপডগুলো কাজে লাগবে। পিটার অনুমান করলো ঐ ট্রাইপডের ওপর মিনিয়েচার লেসার যন্ত্র বসানো থাকবে এবং শত্রু আক্রমণ করলে লেসার বিম প্রয়োগ করে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে।

পিটার দেখলো আর একটা টেবিলে ছ'টা সাব-মেসিনগান রয়েছে। মেসিনগানগুলো চেকোশ্লোভাকিয়াতে তৈরি।

পিটার এবার জিজ্ঞাসা করল. তুমি নাকি কিছু দুঃসংবাদ পেয়েছ ?

হ্যাঁ পেয়েছি কিন্তু ওসব বাজে খবর। এগুলো ইউরো-জাপ কনসরটিয়মের কারসাজি ! ওরা এই খবর প্রচার করেছে যাতে আমরা কঙ্গো না যাই। আর ভলক্যানো ? ওতে আমি ভয় পাই না। তুমি দেখো মুকেংকো ফাটবার আগেই আমরা কাজ সেরে ফিরে আসব। এবার তুমি যাও, আরো একটু ঘুমোওগে যাও, আমরা শিগগির ট্যাঞ্জিয়ারে ল্যাণ্ড করবো, ওখানে ক্যাপটেন মানরো আছে।

"ক্যাপটেন" চার্লস মানরো-এর নাম কোনো দেশের কোনো মিলিটারি খাতায় পাওয়া যাবে না তবে সেইসব দেশের গোয়েন্দা পুলিসের খাতায় নিশ্চয় পাওয়া যাবে। শিকারীর দল তাকে গাইড হিসেবে নিযুক্ত করলেও কোনো অভিযাত্রী দল তাকে গাইড নিযুক্ত করে নি কারণ দক্ষ গাইড হলেও তার সুনাম ছিল না।

কেনিয়ার উত্তর সীমান্তে তার জন্ম। একজন স্কচ ও তারই বাড়ির কাজের লোক একজন ভারতীয় নারীর সে অবৈধ সন্তান। মাউ মাউ গেরিলাদের হাতে মানরোর বাবার মৃত্যু হয় এবং কিছুদিন পরে তার মা টিউবারকিউলোসিসে মারা যায়। ইতিমধ্যে মানরো বড়ো হয়েছে, বেশ একজন শক্ত সমর্থ ও মজবুত যুবক। সে নাইরোবি চলে গিয়েছিল এবং শ্বেতশিকারী দলের গাইডের কাজ করতো। শিকারী বা ট্যুরিস্টদের সে রিজার্ভ ফরেস্টে বা অন্যত্র জীবজন্তু দেখাতে নিয়ে যেতো। এই সময়েই মানরো নিজের নামের আগে 'ক্যাপটেন' উপাধিটা জুড়ে দিয়েছিল। মিলিটারিতে সে কখনও কোনো চাকরি করে নি।

ট্যুরিস্টদের সঙ্গে তার প্রায়ই বনিবনা হতো না, তাই ও কাজ সে সাময়িক ভাবে ছেড়ে দিয়ে উগাণ্ডা থেকে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কঙ্গোতে বন্দুক রাইফেল ইত্যাদি পাচার করতো যাকে বলে "গান রানিং"। এইজন্যে তাকে কিছুদিন গা ঢাকা দিয়েও থাকতে হয়েছিল নইলে ধরা পড়ে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হতো।

১৬৬১ সাল নাগাদ আবার তাকে দেখা গেল। তখন সে কঙ্গোতে জেনারেল মোবুটুর ভাড়াটে সৈনিক। তাদের নেতা ছিল কর্ণেল "ম্যাড মাইক" হোর। হোর বলতো, মানরোকে মেয়েদের কাছ থেকে সরিয়ে আনতে পারলে সে দারুণ কাজ করতে পারতো। ওর মতো জঙ্গলকে কেউ চিনতো না। যখন সে ভাড়াটে সৈনিক ছিলো তখন অত্যাচারী হিসেবে সে বদনাম কিনেছিলো ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের রোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তাকে গা ঢাকা দিতে হয়েছিলো।

১৬৬১ সালে তাকে দেখা গেলো কঙ্গো থেকে অনেক দূরে ট্যাঞ্জিয়ারে।

এখানে সে দারুণ বড়লোকী চালে থাকতো। টাকা কোত্থেকে আসতো তা জনসাধারণ জানতো না তবে 'কাপ্তান' হিসেবে সে খ্যাতি অর্জন করেছিলো। শোনা যায় এই সময়ে সে কমিউনিস্ট সুডানিজ বিদ্রোহীদের ও ইথিওপিয়ার রাজার সমর্থকদের গোপনে অস্ত্র সরবরাহ করতো। তারপর কঙ্গোতে যখন ফরাসি প্যারাট্রুপাররা অবতরণ করেছিলো তখন তাদের সে সাহায্য করেছিলো। টাকা এইসব সূত্রেই আসছিলো।

বিভিন্ন নামে পাসপোর্ট নিয়ে সে আফ্রিকার নানা দেশে ঘুরে বেড়াতো। অফিসাররা তাকে যেমন দেশে ঢুকতে দিতে ভয় পেতো তেমনি ভয় পেতো তাকে ঢুকতে না দিলে। বেআইনী কাজ জেনেও তারা মানরোকে ভয় করতো। লোকটির অসাধ্য কিছু নেই।

কোনো কাজের ভার নিলে যে করে হোক সে কাজ উদ্ধার করে দিত এইজন্যেই তার কুখ্যাতি থাকা সত্ত্বেও সে কাজ পেতো। সে ছিল দক্ষ গাইড এবং তার রেটও ছিল চড়া। বিপজ্জনক জায়গায় যেতে সে ভয় পেত না।

১৯৬১ সালে অ্যাঙ্গোলায় যখন জোর লড়াই চলছে তখন সে আরিটেসা-এর একটা অভিযাত্রী দলের গাইডের কাজ করেছিলো কিন্তু একবার জাম্বিয়াতে দরে না পোষানোর জন্যে আরিটেসা-এর একটা অভিযাত্রী দলকে মাঝ পথে ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছিলো।

একটা জার্মান দল কেমরুন যাবে। তারা আগেই স্থির করেছিলো যে তারা যাকেই গাইড করুক না কেন ক্যাপটেন মানরোকে তারা নেবে না। কিন্তু মানরো ওদের চেয়েও ধূর্ত। সে বেনামে তাদের গাইড হয়ে কেমরুন চলে গেলো।

তবে বিপজ্জন অভিযানে মানরোর তুল্য দ্বিতীয় গাইড নেই এইজন্যেই আরিটেসা তাদের বিরুঙ্গা অভিযানের জন্যে মানরোকেই গাইড মনোনীত করেছিলো। ইতিমধ্যে ইউরো-জাপ কনসরটিয়ম তাকে কিনে না থাকলে তারা মানরোর সাহায্যই নেবে। কিন্তু মানরোকে না পাওয়া গেলে ওরা কি বিনা গাইডে একাই যাবে?

ট্যাঞ্জিয়ার এয়ারপোর্টে কাস্টমস আরভিং আর জেনসেনকে আটকে দিল। খুব সামান্য হলেও ওদের কাছে নাকি হেরয়েন পাওয়া গেছে। ইউরো-জাপ কনসরটিয়মের অন্যতম মেম্বার হাকামিচির টোকিয়োর হাকামিচি ইলেকট্রনিকস কারখানায় আবিষ্কৃত এক সূক্ষ্ম যন্ত্রে হেরয়েনের অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল। হাকামিচির কারখানায় ঐ ডিটেকটর যন্ত্র সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, কবাচি, দিল্লি, মিউনিক এবং ট্যাঞ্জিয়ার এয়ারপোর্টে ব্যবহৃত হচ্ছে। ওরা দু'জন ছাড়া না পেলে ক্যারেনকে একা ওদের কাজ চালাতে হবে। খবরটা ক্যারেন ইউস্টনে ট্রেভিসকে জানিয়ে দিল।

এয়ারপোর্ট থেকে পিটারকে সঙ্গে নিয়ে ক্যারেন সোজা মানরোর বাংলোয় চলে এসেছিল। বাংলোর বারান্দায় চেয়াবে বসে ওরা মানবোর জন্যে অপেক্ষা করছিল।

ওরা প্রায় তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করছিল তবুও মানরোর দেখা নেই অথচ ওরা মাঝে মাঝে মানরোর এবং অন্য ব্যক্তির গলার আওয়াজ পাচ্ছে। অপর ব্যক্তি যারা কথা বলছে তাদের ইংরেজি শব্দ যেটুকু কানে আসছে তা শুনে বোঝা যাচ্ছে ওরা ইংরেজ নয়, ইংরেজি ওদের মাতৃভাষা নয়। তবে কি কনসরটিয়মের লোকেরা আগেই এসে গেল নাকি? ক্যারেন হতাশ হলেও নিরাশ হয় না।

মরক্কোবাসী একটি কিশোরী এসে অদূরে একটি টেবিলের ওপর একটা টেলিফোন রেখে বলে, আপনারা ইচ্ছে করলে এই টেলিফোন ব্যবহার করতে পারেন এমন কি আপনারা অ্যামেরিকার সঙ্গেও কথা বলতে পারেন। এখান থেকে অ্যামেরিকার কনেকশন সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়। মিঃ মানরো এখনি আসছেন।

ক্যারেনের লোভ হয় ইউস্টনে ট্রেভিসের সঙ্গে কথা বলার। সে এবং পিটার নিজেদের চেয়ার টেলিফোনের কাছে নিয়ে যায়। এখান থেকে বাংলোর একটা ঘর দেখা যায়। ওরা দেখল ঘরের মধ্যে একটা টেবিল ঘিরে কয়েকজন

লোক কথা বলছে। ক্যারেন দেখেই বুঝল ওরা কনসরটিয়মের লোক। হাকামিচিকে সে আগে দেখেছে, মানরোকে চাক্ষুষ না দেখলেও তার ফটো দেখেছে।
ক্যারেন আর অপেক্ষা করল না। সে টেলিফোনে অ্যামেরিকা চাইল। ইউস্টন অফিসের ফোন নম্বর বলল। আশ্চর্য! লোকাল কলের মতো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কনেকশান পেলো। ট্রেভিসকে পরিস্থিতি জানিয়ে বললো, একটা কিছু করো। ওদের ধোঁকা দেবার চেষ্টা করো যাতে ওরা ওদের অভিযান বাতিল না করলেও যেন কয়েকটা দিন পেছিয়ে দেয়।
ট্রেভিস বলে, আমি রজার্সকে বলছি, দেখি সে কিছু করতে পারে কি না। মানরোর ফোন নম্বরটা কতো?
টেলিফোনের ডায়ালের মধ্যে ফোন নম্বর লেখা ছিল। ক্যারেন ফোন নম্বরটা জানিয়ে দেয়।
টেলিফোনে কথা শেষ হতেই ক্যারেন লক্ষ্য করে হাকামিচি এবং একজন জার্মান তাকে লক্ষ্য করছে।
ক্যারেনের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। মনে হলো ও বুঝি কাউকে চিনতে পেরেছে। হাকামিচি নয়, অন্য কেউ। সে হঠাৎ উঠে যায় এবং সেই সঙ্গে ঘর থেকে একটি জার্মান সুদর্শন যুবক ক্যারেনের দিকে এগিয়ে আসে। ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে। ওদের নিশ্চয় আগে থেকে পরিচয় ছিল। ওরা কিছু কথা বলে যা পিটার শুনতে পায় না। মনে মনে পিটার বিরক্ত।
পিটার লক্ষ্য করে জাপানী ভদ্রলোকটি ভ্রূকুটি করছে অর্থাৎ সেও বিরক্ত। ব্যাপারটা কি? এত বাড়াবাড়ি কেন? আলিঙ্গন, চুম্বন? ক্যারেন ফিরে আসতে পিটার জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার ক্যারেন?
ব্যাপার কিছু, নয়, রিখটার আমার বন্ধু, আমরা দুজনে একসঙ্গে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে একসঙ্গে পড়েছি, দুর্দান্ত ছাত্র ছিল, যদিও আমিই ফার্স্ট হতুম কিন্তু সবসময়ে ওর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারতুম না, বর্তমানে ওর তুল্য টোপোলজিস্ট ইউরোপে নেই। কিন্তু ও

তো আমাদেব প্রতিযোগী দলের লোক, ওর সঙ্গে কথা বলার কি দরকার?

ক্যাবেন বলে, হিংসে হচ্ছে নাকি ? আমি তোমাকেও কিস কবতে পারি।

না, আমাদের অভিযানের বিষয় কোনো কথা হয় নি তবে ওরা জানে আমাদের সঙ্গে একটা গোরিলা আছে।

টাই-টাই-এব কথা জিজ্ঞাসা করছিল নাকি ?

হ্যাঁ, আমি বললুম গোরিলাটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এই যে ক্যাপটেন মানবো আসছে।

মানবো ইসারা কবে ওদের পাশের ঘরে যেতে বললো। পাশের ঘবে ক্যারেন আর পিটার যেতে মানবো বললো,

তাহলে ডঃ বস তোমরাও কঙ্গো যাচ্ছ ?

নিশ্চয় যাচ্ছি, তুমি আমাদেব নিয়ে যাবে তো মানবো ?

এই কথাব মানবো উত্তব না দিয়ে দর কষাকষি আরম্ভ করল। সে বললো ভিরুঙ্গা একটা বাগানবাড়ি নয়। ঘোর জঙ্গলও ডেঞ্জারাস বাস্তাব কথা বাদ দিয়েও বলা যায়। কিগ্রানি জাতিরা এখন ক্ষেপে গেছে। তাবা আবার মানুষেব মাংস খেতে আরম্ভ কবেছে। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে ভিরুঙ্গা যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাদেব চেহারা ও পোশাক এমন যে ওবা জঙ্গলের সঙ্গে বেমালুম মিশে থাকে। কখন কোথা থেকে বিষাক্ত একটা তীব এসে যে পিঠে বেঁধে তা কেউ বলতে পাবে না। তবুও তাদেব চোখ এড়িয়ে যেতে হবে এবং তা যদি কেউ পাবে তো মানবোই পারবে অতএব কুলিভাড়া সমেত আমাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দিতে হবে।

মানবোব পবনে খাকি বুশ শার্ট ও খাকি প্যাণ্ট। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মুখ থেকে সিগার নামিয়ে ক্যারেনের উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল। পাশের ঘবে টেলিফোন বেজে উঠল কিন্তু কি কথা হচ্ছে এঘর থেকে শোনা গেল না।

মানবো তুমি মাত্র পঞ্চাশ হাজার ডলার চাও ? বেশ তা দেওয়া যাবে। তুমি যদি আমাদেব···

ক্যারেনের কথা শেষ করতে না দিয়ে মানবো পাশের ঘরে ঢুকে হাকামিচি-দের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। ক্যারেন ও পিটার দেখলো একটু পরেই

হাকামিচি তার দলবল নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মানরো তাদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলো। মনে হলো ওরা মানরোর শর্তে রাজি হলো না। মানরো হয়তো পঞ্চাশের বেশি চেয়েছিলো।

মানরো ঘরে ফিরে আসতে ক্যারেন জিজ্ঞাসা করলো, কি মানরো, ওরা পঞ্চাশ হাজার ডলারের বেশি দিতে রাজি হলো না?

না তা নয়। ওরা টেলিফোনে কি শুনে হঠাৎ চলে গেলো। আমাকে বললো আমার সঙ্গে পরে কথা বলবে।

ক্যারেন মনে মনে ভাবল ট্রেভিস কিছু কারসাজি করেছে। ও নিশ্চয় এমন খবর শুনিয়েছে যাতে ওরা যাত্রা স্থগিত রাখছে। হয়তো বলেছে মুকেংকো ভলক্যানো আবার তার লকলকে জিভ বার করেছে।

তাহলে তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি তো মানরো? আমরা এখনি স্টার্ট করতে চাই। তোমাকে কত আগাম দিতে হবে।

হ্যাঁ, আমি তোমাদের প্রস্তাবে রাজি। চল আমরা ডিনার খেয়ে নিই, পাশের ঘরে ডিনার দেওয়া হয়েছে।

ওরা ডিনার টেবিলে বসল। রান্না চমৎকার সুস্বাদু। মানরো বলল, কনসরটিয়ম বুঝতে পারছে না একজন যুবক একটা গোরিলা নিয়ে কি করে? আর দলের নেত্রী যুবতী কেন? সে কি খুঁজতে ভিরুঙ্গা যাচ্ছে?

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল-গ্রেড ডায়মণ্ড, ক্যারেন বললো।

পিটার বলল, স্টুটা তো চমৎকার।

হ্যাঁ, তাজিন মানে উটের মাংস।

উটের মাংস শুনে পিটারের ক্ষিধে যেন জুড়িয়ে গেল।

মানরো বলল, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল-গ্রেড ডায়মণ্ড তো পৃথিবীতে অনেক দেশে পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়া, ব্রেজিল, রাশিয়া, ক্যানাডা এমন কি তোমাদের দেশ আরাকানসাসেও পাওয়া যায়। নিউ ইয়র্ক স্টেট আর কেণ্টাকিতেও পাওয়া যায় শুনেছি তবে এই বিপদসংকুল ভিরুঙ্গায় কেন?

কারণ টাইপ টু-বি বোরন কোটেড ব্লু ডায়মণ্ড আর কোথাও পাওয়া যায় না, মাইক্রো-ইলেকট্রনিক যন্ত্রে অপরিহার্য। গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে

মানরো বললো, সে কথা ঠিক। অমন ব্লু ডায়মণ্ড আর কোথাও পাওয়া যায় না।

হঠাৎ বুলেটের আওয়াজ। মানরো বললো, শুয়ে পড়ো, মেঝেতে শুয়ে পড়ো। ক্যারেন ও রস মানরোর সঙ্গে মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। জানালার ভেতর দিয়ে কয়েক ঝাঁক গুলি ছুটে এসে দেওয়াল বিদ্ধ করলো।

একটা জিপের আওয়াজ শোনা যেতে মানরো বললো, ওঠো, ওরা চলে গেছে, খাওয়াটা মাটি করে দিল।

ওরা কারা?

কনসরটিয়ম আবার কে? ওরা সব পারে।

পুলিসের গাড়ির সাইরেন শোনা গেল। মানরো বললো, ওরা কফিটাও খেতে দিল না। এদিকে এই পিছন দিক দিয়ে এস।

এক ঘণ্টা পরে নাইরোবির পথে ওদের প্লেন ছাড়ল।

ট্যাঞ্জিয়ার থেকে নাইরোবি কাছে নয়। সাড়ে তিন হাজার মাইলের ওপর। আফ্রিকা মহাদেশটাই তো বিরাট, উত্তর অ্যামেরিকা ও ইউরোপ এর ভেতর ঢুকে যাবে, দক্ষিণ অ্যামেরিকার দ্বিগুণ।

নাইরোবি পৌঁছতে ওদের আট ঘণ্টা সময় লাগবে। ক্যারেন রস তার কমপিউটার কনসোলের সামনে বসে আছে। স্ক্রীনে সে আফ্রিকার একটা ম্যাপ ফুটিয়ে তুলেছে। কি দেখছে সেই জানে। পিটার টাই-টাইকে নিয়ে ব্যস্ত। অবশ্য টাই-টাই এখনও পর্যন্ত কোনো ঝামেলা বা উৎপাত করে নি।

ওরা একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করতে চলেছে। ওরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে টাইপ টু-বি বোরন কোটেড ব্লু ডায়মণ্ড আবিষ্কার করতে পারে তাহলে কমপিউটার জগতে একটা বিপ্লব আসবে। পৃথিবীর সমস্ত কমপিউটার

তখন পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবে এবং আরও কত কি যে হতে পারবে তা এখন বলা সমিচীন হবে না। সেটা মিলিটারি সিক্রেট।

ক্যারেনের চিন্তা আপাততঃ কনসরটিয়ম নিয়ে। তারা যাত্রা বাতিল করে নি, স্থগিতও রাখে নি। ট্যাঞ্জিয়ারে মানরোর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই ওরা প্লেনে উঠেছে। ইউস্টনে ট্রেভিসকে ওরা একটা মেসেজও পাঠিয়েছে, কেন আমাদের বার বার ধাপ্পা দিচ্ছ? তোমরা আমাদের সঙ্গে পারবে না। ধরেই নাও কঙ্গো সরকারের কাছ থেকে ব্লু ডায়মণ্ড তোলার সমস্ত খনিজস্বত্ব আমরা পেয়ে গেছি।

ট্রেভিস একবার ভেবেছিল অভিযান ফিরিয়ে আনবে নাকি? কিন্তু ক্যারেন যেমন জেদী তেমনি একগুঁয়ে। সে উত্তর দিল শেষ না দেখে সে ফিরবে না তাতে তার প্রাণ যায় যাবে।

পিটার ইলিয়ট এক সময়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা ক্যারেন আমরা এত অর্থ ব্যয় ও এত পরিশ্রম না করে যেকোনো হীরের ওপর বোরন প্রলেপ দিলে কি অভীষ্ট কাজ হতো না।

ক্যারেন উত্তর দেয়, সে চেষ্টা হয়েছে ইলিয়ট। ম্যাকফি সে চেষ্টা করেছিল, প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছিল কিন্তু কাজ হয় নি অতএব ম্যাকফি-এর পরীক্ষা পরিত্যক্ত হয়েছিল। ব্লু ডায়মণ্ডের মতো অপর ধাতু বা খনিজ পদার্থ আবিষ্কারের চেষ্টা অনেক হয়েছে এবং আজও হচ্ছে কিন্তু ব্লু ডায়মণ্ডের মতো কাজ দিতে পারে এবং প্রাকৃতিক ব্লু ডায়মণ্ড তাও আবার টাইপ টু-বি, এমন কিছু আজও আবিষ্কৃত হয় নি।

আট ঘণ্টা বিমানপথে পিটার ব্লু ডায়মণ্ড ও তার কার্যকারিতা এবং আধুনিক কমপিউটার সম্বন্ধে বহু তথ্য ও তত্ত্ব শুনল এবং বুঝল যে প্রাকৃতিক ব্লু ডায়মণ্ড আজও অপরিহার্য এবং সেটি সংগ্রহ করতে বিপদের ঝুঁকি নিতেই হবে।

ক্যারেনের খেয়াল সবদিকে। এক সময়ে সে বলল, আমরা নাইরোবির ওপর এসে গেছি, এবার নামব।

আধুনিক নাইরোবি পৃথিবীর যে কোনো বড় শহরের সমতুল। এই শহরেও আছে আকাশ ছোঁয়া বাড়ি, সুপার মার্কেট, ফরাসি রেস্তারাঁ।
১৬ জুন সকালে নাইরোবি ইন্টারন্যশানাল এয়ারপোর্টে আরিটেসা-এর জেট বিমানখানা নামল এবং নামার সঙ্গে সঙ্গে মানরোও কাজে নেমে গেল। মাল বইবাব কুলি এবং কয়েকজন সহকারী দরকার। দু ঘণ্টার মধ্যে নাইরোবি ছেড়ে যেতে হবে।
নাইরোবিতে নামার কয়েক মিনিট মধ্যে ক্যারেন তার কমপিউটার কন-সোল-এ ইউস্টান থেকে ট্রেভিস প্রেরিত একটা বার্তা পেল। ট্রেভিস জানিয়েছে যে আগেকাব অভিযাত্রী দলের অন্যতম জিওলজিস্ট পিটার-সনকে পাওয়া গেছে।
পাওয়া গেছে? উত্তেজিত কণ্ঠে ক্যারেন প্রশ্ন করে, কোথায় সে?
ট্রেভিস উত্তর দিল, মর্গে।
মর্গে? তার মানে পিটারসন মৃত। ক্যারেন ও পিটার তখনি হাসপাতালে ছুটল।
হাসপাতালে মর্গে ওরা দেখল স্টেনলেস স্টীল টেবিলের ওপর প্রায় ওদেরই সমবয়সী একটি ব্যক্তির মৃতদেহ। চাদর তুলে দেওয়া হলো। হাত দুটো একেবারে গুঁড়িয়ে গেছে, দেহ ফুলে উঠেছে। রং বেগুনি। এরকম একটা শব দেখতে হবে তা ওরা আশা করে নি।
কাছে হাসপাতালের একজন প্যাথোলজিস্ট দাঁড়িয়ে ছিল। সে ক্যারেনকে প্রশ্ন করল, তোমার নাম কি?
ক্যারেন এলেন রস।
তোমার নাগরিকত্ব ও পাসপোর্ট নম্বর?
অ্যামেরিকান, এফ ১৪১২৬৪৯
মিস রস তুমি কি এই ব্যক্তিকে সনাক্ত করতে পার?
পারি, এর নাম জেমস রবার্ট পিটারসন।
তোমার সঙ্গে মৃতের সম্পর্ক কি?
আমরা এক সঙ্গে কাজ করতুম।

মৃতের বয়স কতো ?

উনত্রিশ, এই তো মে মাসে পিটারসন কঙ্গো এসেছিল ।

তারপর আর তোমাদের দেখা হয় নি ?

না, কিন্তু পিটারসনের কিসে মৃত্যু হয়েছে ? ক্যারেন জিজ্ঞাসা করে। প্যাথোলজিস্ট বলে, সে এক অবিশ্বাস্য কাহিনী ! একটা ছোটো চার্টার করা কার্গো প্লেনে তাকে নাইরোবি এয়ারপোর্টে আনা হয়। তখনও সে বেঁচে ছিল কিন্তু জ্ঞান ছিল না। সে প্রচণ্ড শ্যক্ পেয়েছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। হাসপাতালে আসার কয়েক ঘণ্টা পরে তার মৃত্যু হয়। জ্ঞান ফিরে আসে নি। যে কার্গো প্লেনে ওকে আনা হয়েছিল সেই কার্গো প্লেনটার গারোনা ফিল্ডে নামবার কথা ছিল না, কিন্তু একটা যান্ত্রিক গোলোযোগের জন্যে তাকে নামতে হয়েছিল। গারোনা ফিল্ড জঙ্গলের মধ্যে। সেই সময় পিটারসন কোনোরকমে দেহটা টানতে টানতে এনে পাইলটের কাছে লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারায়। ভাঙাচোরা দেহটা নিয়ে ও যে কি করে গারোনা পর্যন্ত এসেছিল সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। আঘাতগুলি সদ্যোপ্রাপ্ত ছিল না, অন্ততঃ চার দিনের পুরনো। সে তীব্র দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিল।

পিটারসন এই আঘাত কিসে বা কি ভাবে পেল ? তোমরা কিছু অনুমান করতে পেরেছ ? ক্যারেন জিজ্ঞাসা করে।

মানুষের দেহে এরকম আঘাত আমরা কখনও দেখি নি। মোটর প্লেন বা ট্রেন দুর্ঘটনায় হাড়গোড় এভাবে ভাঙে না, যান্ত্রিক কোনো আঘাতে পিটারসনের এমন অবস্থা হয় নি তবে কিসে হয়েছে আমি এখনও পর্যন্ত সঠিক বলতে পারছি না। পিটারসনের নখের তলায় রক্ত এবং দেহে কয়েকটা চুল পাওয়া গেছে। সেগুলো নিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

ঘরের অপর প্রান্তে আর একজন প্যাথোলজিস্ট মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ তুলে বলল, চুলগুলো মানুষের চুল কখনোই নয় এবং রক্তও মানুষের নয় যদিও মানুষের রক্তের কাছাকাছি। চুল ও রক্ত বানরজাতীয় কোনো পশুর হতে পারে। একটু অপেক্ষা কর। আমি কমপিউটারে পরীক্ষা করে তোমাদের এখনি জানাচ্ছি।

কয়েক মিনিট পরে প্যাথোলজিস্ট ওদের বললো, গোরিলার রক্ত, ওর নখের তলায় যা পাওয়া গেছে তা হলো গোরিলার রক্ত। অতএব চুলও গোরিলার।

প্রথম প্যাথোলজিস্ট বললো, তাহলে গোবিলা পিটাবসনের এই অবস্থা করেছে, তা করতে পারে, গোবিলা অত্যন্ত শক্তিশালী জীব, তারা এই-ভাবেমানুষেব হাড়গোড় ভাঙতে পাবে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে গারোনার কাছে গোরিলা এলো কোথা থেকে ?

বার্কলেতে থাকবাব সময় প্রোজেক্ট টাই-টাই-এর চিকিৎসকেরা প্রতি একদিন অন্তর টাই-টাই-এব ইউরিন, প্রতি সপ্তাতে স্টুল, প্রতি মাসে রক্ত এবং তিন মাস অন্তব দাঁত পরীক্ষা করা হতো। টাই-টাই এই ব্যব-স্থায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

এখন সে অভিযানে চলেছে, বেশ কিছুদিন তাব ইউবিন্ স্টুল ও ব্লাড পরীক্ষা করা যাবে না। আজই শেষ সুযোগ। তাই নাইরোবিব এই প্রাই-ভেট ক্লিনিক থেকে প্যাথোলজিস্টেব একজন সহকাবীকে ডেকে আনা হয়েছে।

৭৪৭ কার্গো জেট প্লেনের ভেতবেই টাই-টাই রয়েছে তবে রক্ত নেবার জন্য তাকে প্যাসেঞ্জারদের বসবার ঘরে আনা হয়েছে।

বক্ত নেবার জন্যে সিরিঞ্জ বাগিয়ে ধরেও সহকারী ভয় পাচ্ছে। ঐ হাতে গোরিলা তাকে যদি একটা থাপ্পড় বসিয়ে দেয় তাহলে তো সে গেছে। পিটার তাকে সাহস দিয়ে বলে, তোমার কোনো ভয় নেই। টাই-টাই ভাল মেয়ে, ও তোমাকে কিছু বলবে না তাছাড়া ও রক্ত দিতে অভ্যস্ত। ঠিক বলছ তো ? সহকারীর প্রশ্ন।

এই সময় টাই-টাই সহকারীকে নির্বাক ভাষায় ইঙ্গিত করে বললো, টাই-টাই গুড গোরিলা। পিটার সেটা সহকারীকে বুঝিয়ে দিল।

পিটার আশ্বাস দেওয়াতে সহকারী টাই-টাই-এর রক্ত নিয়ে বললো, তুমি সাহস দিলে কি হবে ওটা তো একটা অসভ্য জানোয়ার।

ভাল কথা বললে না মিস্টার টাই-টাই ক্ষুব্ধ হবে। তুমি ওর কাছে ক্ষমা চাইবে। টাই-টাইও পিটারকে বললো, অসভ্য জানোয়ার কাকে বলছে? কিছু না টাই-টাই ও তো আগে কখনও গোরিলা দেখে নি তাই ভয় পাচ্ছে পিটার বললো।

সহকারী বললো, কি বললে? ওর কাছে আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে?

হ্যাঁ, তোমাকে যদি কেউ জানোয়ার বলে তাহলে তোমার কি মনে হবে?

গোরিলাটা কি ইংরেজি বোঝে নাকি?

হ্যাঁ ও ইংরেজি বোঝে ও সাংকেতিক ভাষায় বলে।

আমি বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস কর না? এই দেখ, টাই-টাই মিস্টারকে বাইরে যাবার পথ দেখিয়ে দাও তো?

টাই-টাই হেলতে-দুলতে উঠে এসে দরজা খুলে দিয়ে সহকারীকে বাইরে যেতে ইসারা করলো। সহকারী নিজের ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে অবাক বিস্ময়ে টাই-টাই-এর দিকে চাইতে চাইতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টাই-টাই পিটারকে বললো, মানুষ বোকা লোকটা।

যেতে দাও টাই-টাই, এস তোমার লোম থেকে পোকা বেছে দিই। টাই-টাই শুয়ে পড়লো। পিটার তার মাথায় পিঠে ও হাতে লোমের, মধ্যে বিলি কাটতে লাগলো।

মিনিট পনেরো কাটল। কখন যে দরজাটা খুলেছে পিটার টের পায় নি। কিন্তু সে হঠাৎ দেখল একটা ডাণ্ডা তার মাথার ওপর নেমে আসছে। সে কিছু করবার আগে সেটা তাকে আঘাত করলো এবং তার পরই সে অজ্ঞান!

কোথাও থেকে চোখের ওপর চোখ ধাঁধাঁনো আলো পড়তে পিটার চোখ মেলে চাইলো।

অচেনা একটা কণ্ঠস্বর বললো, উঁহু, নড়বেন না, আচ্ছা ডান দিকে চেয়ে

দেখুন তো···এবার বাঁ দিকে···দেখুন তো আঙুল মুড়তে পারেন কি না।
কি ব্যাপার? পিটার বুঝতে পারে না। সে তো প্লেনের মধ্যেই শুয়ে রয়েছে তবে মাথায় ভীষণ ব্যথা। তার কি হয়েছে? জোর আলোটা নিবিয়ে দেওয়া হলো। পিটার দেখলো সাদা স্যুট পরা একজন আফ্রিকান ডাক্তার গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে তার পাশে বসে রয়েছে। ডাক্তার তার মাথায় হাত বুলিয়ে হাত তুলতে তার আঙুলে রক্ত দেখা গেল। ডাক্তার বললো,
ভয় পাবার কিছু নেই, শুধু মাথার চামড়াটা কেটে গেছে, ফ্র্যাকচার হয় নি।
মানরোর দিকে চেয়ে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলো, কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিল?
মানরো বলল, ঠিক বলতে পারব না, বেশিক্ষণ নয়, মিনিট দুই তিন হবে হয়তো, কিরকম মনে করছ পিটার?
পিটার উত্তর দেবার আগে ডাক্তার বললো, চব্বিশ ঘন্টা বিশ্রামে রাখতে হবে, ভয়ের কিছু নেই।
এই সময়ে ক্যারেন ঘরে ঢুকল। ডাক্তারের কথা সে শুনতে পেয়েছিল, বললো, চব্বিশ ঘন্টা! আমাদের এখানে আটকে থাকতে হবে?
টাই-টাই কোথায়? পিটার জিজ্ঞাসা করলো।
মানরো উত্তর দিল, ওরা চুরি করে নিয়ে গেছে।
মানরোর হাতে ইঞ্জেকশনের অ্যামপুলের মতো ছোট্ট একটা শিশি ছিল, তার এক দিকে একটা ছুঁচ বসানো, ছুঁচের ডগাটা ভাঙা, শিশির গায়ে জাপানী ভাষায় কিছু লেখা আছে। মানরো সেটা পিটারকে দেখিয়ে বললো, এইটে এখানে পাওয়া গেছে।
টাই-টাই চুরি হয়েছে? পিটার উঠে বসল। ডাক্তার বললো, আরে শুয়ে পড়। পিটার বললে, আমার কিছু হয় নি, আই ফিল ফাইন, দেখি শিশিটা। শিশিটা হাতে নিয়ে পিটার বললো, ঠাণ্ডা কার্বন ডাই-অকসাইড, আসলে এটা একটা ক্ষুদে তীর, গ্যাস-গান থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তীরের ডগাটা ভেঙে গেছে, হয়তো টাই-টাই এর গায়ে বিঁধে আছে।
পিটার শিশিটা শুঁকে বললো, আরে সর্বনাশ! এতো 'লোব্রাকসিন', খুব দ্রুত

কাজ করে, পনের সেকেণ্ডের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে কিন্তু লিভারের ক্ষতি করে। আমার মাথায় ডাণ্ডা মেরে আর টাই-টাইকে এই তীর ছুঁড়ে অজ্ঞান করে ওরা ওকে কিডন্যাপ করেছে।

পিটার মানরোর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ডাক্তার আপত্তি করল। পিটার বলল, আমার কিছু হয় নি, আমি ঠিক আছি।

ক্যারেনের হাতে পুলিসের বেটনের মতো ছোট একটা লাঠি ছিল। সেটা কিসের তৈরি তা পিটার জানে, কি তার কাজ এবং ক্যারেন ওটা হাতে নিয়ে কেনই বা সবকিছুর ওপর নাড়ছে তাও সে জানে না কিন্তু কম-পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রগুলো যা আছে সেখান থেকে মাঝে মাঝে একটা আওয়াজ আসছে। কোনো মিটিং-এ বা কোথাও মাইক ফিট করে সেটি চালু করবার সময় যেমন একটা আওয়াজ পাওয়া যায় এই আওয়াজটা অনেকটা সেই রকম।

কমপিউটারের ঘর ঘুরে ক্যারেন যাত্রী বসবার ঘরে আসতে আবার সেই আওয়াজ। একটা সিট থেকে ক্যারেন কালো মতো একটা ক্ষুদে যন্ত্র তুলে নিয়ে সেটা দেখে বলল, আড়িপাতা যন্ত্র বসাবার জন্যে ওরা লুকিয়ে একটা মানুষ প্লেনে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। আড়িপাতা যন্ত্র নিশ্চয় ওরা বসিয়েছে। সেগুলো খুঁজে বার করতে সময় লাগবে কিন্তু অতক্ষণ আমরা এখানে বসে থাকতে পারি না।

ক্যারেন কমপিউটারের কাছে ফিরে এসে সামনে বসে কিছু টাইপ করতে আরম্ভ করল। পিটার জিজ্ঞাসা করলো—

কনসরটিয়ম এখন কোথায়?

মানরো বলল, নাইরোবির বাইরে কুবালা এয়ারপোর্ট থেকে মূল পার্টি ঘণ্টা ছয়েক আগে চলে গেছে।

ছ ঘণ্টা? তাহলে ওরা টাই-টাইকে সঙ্গে নিয়ে যায় নি।

ক্যারেন বলল, টাই-টাইকে ওরা সঙ্গে নেবে কেন? টাই-টাই ওদের কি কাজে লাগবে? আমাদের দেরি করিয়ে দেওয়া হয়তো ওদের মতলব। তবে কি ওরা টাই-টাইকে মেরে ফেলেছে?

মানরো নিস্পৃহ কণ্ঠে বললো, হতে পারে।
হা ভগবান··· !
মানরো বলল, তবুও আমাব মনে হয় টাই-টাইকে ওরা মারবে না, মারতে সাহস করবে না। টাই-টাই বিখ্যাত গোরিলা। টিভি-তে ওকে অনেকে দেখেছে, খববের কাগজে ওব ছবি ও খবর ছাপা হয়েছে বরঞ্চ ওরা তোমাকে মারতে পারে কিন্তু টাই-টাইকে নয়।
মানরোর কথার জের টেনে ক্যারেন বলল, কনসরটিয়ম টাই-টাইকে নিয়ে কি করবে ? তাছাড়া ওরা জানেই না যে আমাদের সঙ্গে টাই-টাই কেন আছে ? ওরা খালি আমাদের দেবি করিয়ে দিতে চায় তবে ওবা আমাদের সঙ্গে পেবে উঠবে না।
ক্যারেনে কথা বলাব ঢং দেখে পিটারেব সন্দেহ হলো ক্যাবেন বুঝি টাই-টাইকে ছেড়েই চলে যাবে। সে আর অপেক্ষা কববে না। তাই সে বললো, কিন্তু টাই-টাইকে ছেড়ে আমরা যেতে পারি না। তাকে উদ্ধাব করতেই হবে।
মানবোর দিকে চেয়ে ক্যারেন জিজ্ঞাসা করলো। আমাদের প্লেন ছাড়তে আর কতসময় বাকি আছে? তারপব নিজেই সে কমপিউটার কনসোলের ওপরে ডিজিটাল ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল। বাহাত্তর মিনিট মানে এক ঘণ্টা বারো মিনিট, মানরো তুমি কাজে লেগে যাও।
আমি তো কাজে লেগেই আছি ক্যারেন।
আমরা এই প্লেনে যাব না। প্লেনে এখন যাওয়া বিপজ্জনক। ওরা যখন আমাদের প্লেনের ভেতর ঢুকে একটা গোরিলাকে অজ্ঞান করে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে তখন ওরা কোথাও যে স্যাবোটাজ করে যায় নি তাব প্রমাণ কি ? তুমি এখনি অন্য প্লেনেব ব্যবস্থা কর।
পিটার ব্যস্ত হয়ে উঠল। সে বলল, তুমি যদি টাই-টাইকে ছেড়ে চলে যাও তাহলে আমিও যাব না।
ইতিমধ্যে কমপিউটার মারফত ক্যারেন বোধ হয় ট্রেভিসের কাছে মেসেজ পাঠিয়েছিল। পিটাবের কথা শেষ হতে না হতেই কমপিউটার পর্দায় ফুটে

উঠলো : তোমরা গোরিলাকে ছেড়ে চলে যাও। ব্যাপারটা জরুরী সময় খুব কম। ফরগেট গোরিলা।

পিটার তবুও জোর দিয়ে বললো, কিন্তু তোমরা টাই-টাইকে ফেলে চলে যেতে পার না ক্যারেন। আমি তাহলে এখানে থেকে যাব।

ক্যারেন বললো, তাহলে শোনো পিটার ইলিয়ট আমি কখনই মনে করি নি যে একটা গোরিলা তা সে কথা বলতে পারুক আর না পারুক আমাদের এই অভিযানের জন্যে প্রয়োজনীয় এবং সেইজন্য তুমিও আমাদের অপরিহার্য নও। আমরা কনসরটিয়মকে ধোঁকা দেবার জন্যে টাই-টাইকে সঙ্গে রেখেছিলুম। তুমি কি জান যে আমি যখন ইউস্টন থেকে স্যান ফ্রানসিসকো এসেছিলুম তখন আমার ওপর ওরা নজর রাখছিল। ওরা আমাকে ফলো করছিল ? দরকার মনে করলে আমি তোমাদের দু'জনকেই এখানে রেখে চলে যাব এছাড়া আমার আর কিছু করার নেই।

আশ্চর্য ! তুমি এ কথা আমাকে বলতে পারলে ক্যারেন ?

যা বলেছি ঠিকই বলেছি পিটার, বলতে বলতে ক্যারেন পিটারের হাত ধরে তাকে টেনে প্লেনের বাইরে নিয়ে এসে কিছু দূর যেয়ে সে বলল, পিটার টাই-টাই বা তোমাকে এখানে রেখে আমরা চলে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

সে কি ? তুমি যে এখনি বললে ?

আরে তুমি এত বোকা কেন ? তুমি কি বুঝতে পারছ না ওরা আমাদের প্লেনে আড়িপাতা যন্ত্র বসিয়েছে। আমাদের সব কথা ওরা শুনছে ?

সান ফ্রানসিসকোতে কে তোমাকে ফলো করেছিল ?

কে আবার ? কেউ নয়। এসব কথা তো ওদের ধাপ্পা দেবার জন্যে বললুম। শোনো, আমাদের গত অভিযানে যে ধ্বংস কাণ্ড হয়ে গেছে এবং সে বিষয়ে ট্রেভিসের মতামত যাই হোক না কেন আমার বিশ্বাস কাণ্ডটা গোরিলারাই ঘটিয়েছে আর সেইজন্যেই আমি টাই-টাইকে সঙ্গে এনেছি যাতে আমরা টাই-টাই-এর সাহায্যে স্থানীয় গোরিলাদের কাছ থেকে কিছু খবর সংগ্রহ করতে পারি।

কিন্তু টাই-টাইকে আমরা এখন পাব কোথায় ? আর মাত্র ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তাকে কি উদ্ধার করতে পারবে ?
তুমি দেখই না আমি কুড়ি মিনিটের মধ্যে টাই-টাইকে খুঁজে বার করবো।

ক্যারেন রস কাজের মেয়ে। সে নিজেকে সর্বত্র জাহির করতে পারে। সকলকে সে আদেশ করতে পারে। তার আদেশ উপেক্ষা করা কঠিন। সে নাইরোবি পুলিস হেডকোয়ার্টারে যেয়ে একটা হেলিকপটারের ব্যবস্থা করে পিটারকে নিয়ে তাতে উঠে বসল। তার কোলে একটা চৌকো হলদে বাক্স আর মাথায় ইয়ারফোন, হলদে বাক্সর সঙ্গে তার দিয়ে ইয়ার-ফোন যুক্ত। হলদে বাক্সর ওপব কয়েকটা বোতাম আছে, ক্যারেন মাঝে মাঝে এক একটা বোতাম টিপছে আর পাইলটকে নির্দেশ দিচ্ছে, আরও নামাও, হ্যাঁ এবার পুব দিকে চলো।
পিটার দেখল হলদে বাক্সর ওপর কাচেব নিচে ডিজিটাল ক্লকের মতো সংখ্যা ফুটে উঠেছে। ক্যারেন আদেশ কবল, এবার উত্তব-পুবে চল। ওরা একটা ইয়ার্ডের ওপর এল, ইয়ার্ডে কতরকম ভাঙা মোটরগাড়ি ও যন্ত্রের পাহাড় জমে আছে। হেলিকপটার যখন একটা লাল রঙের ভ্যানের ওপর এসেছে তখন হলদে বাক্সর সমস্ত সংখ্যাগুলো জিরো হয়ে গেল।
হেলিকপটার থামাও, মই নামিয়ে দাও, আমরা নামব, ক্যারেন আদেশ করল। পাইলট হেলিকপটার থামিয়ে মই নামিয়ে, দিল। ওরা দুজনে নামল। ক্যারেন পাইলটকে, বললে তুমি হেডকোয়ার্টারে ফিরে যেয়ে একটা প্রিজন ভ্যান এখনি পাঠাবার ব্যবস্থা কর।
ওরা নামবার সঙ্গে সঙ্গে হেলিকপটার ফিবে গেল। ক্যারেন সেই লাল রঙের ভ্যানের পিছন দিকে এসে দরজা খুলে দিল। ভেতরে টাই-টাই শুয়ে রয়েছে। স্টিকিং প্লাস্টার তার হাত ও পায়ে জড়িয়ে গেছে, মুখও বন্ধ। টাই-টাই নড়তে পারছে না।
পিটার লাফিয়ে ভ্যানের ভেতর ঢুকলো। ভাঙা ছুঁচটা টাই-টাই-এর বুকে বিঁধে ছিল। ইলিয়ট সেটা বার করে নিয়ে ওর হাত পা থেকে স্টীকিং

প্লাস্টার খুলে দিল। মুক্ত হয়ে টাই-টাই পিটারকে জড়িয়ে ধরলো
ক্যারেন বললো, চলো যাওয়া যাক, এখনও চল্লিশ মিনিট সময় আছে। পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে ওরা বেশি দূরে আসে নি। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে না করতেই একখানা পুলিসের ভ্যান এসে পড়লো।

ওরা যখন টাই-টাইকে খুঁজতে বেরিয়েছিল সেই সময়ের মধ্যে ওদের কার্গো জেট প্লেনের পাশে একটা ছোট ফোকার এস একশচুয়াল্লিশ বিমান এসে গেছে। বড় প্লেন থেকে ছোট প্লেনে মাল বোঝাই করা হচ্ছে। মানবো তদারক করছে।

এবার আফ্রিকার যে অঞ্চলের ওপর দিয়ে ওদের উড়ে যেতে হবে সেজন্যে ওদের ছোটো বিমানের প্রয়োজন ছিল কারণ এর পর বড় প্লেন নামবার উপযুক্ত এয়ারফিল্ড নেই।

পুলিস ভ্যানে চাপিয়ে টাই-টাইকে এনে ফোকার প্লেনে চাপানো হলো। সে খুব ভয় পায় নি তবে তার সারা গায়ে ব্যথা। যথোপযুক্ত ওষুধ খাইয়ে ও দেহ ম্যাসাজ করে তাকে সুস্থ করা হলো। হাজার হলেও পশু তো। মানুষের মতো সূক্ষ্ম অনুভূতি তার নেই।

কয়েকজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি মাল বোঝাই করছিল। তারা নিজেদের মধ্যে খুব হাসিঠাট্টা করছিল এবং এবকম ভাব প্রকাশ করছিল যে এইসব মালপত্তর তাদের। টাই-টাই বিরক্ত হচ্ছিল। এই হাসির কারণ কি সে জানতে চাইছিল কিন্তু কারণ কি হতে পারে তা পিটারও জানে না। ক্যারেনও কি জানে?

ক্যারেন এসে পড়ার পর থেকে সেই তদারক করছিল কারণ এবার কমপিউটার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি অন্য বিমানে তোলা হচ্ছিল। আর ইলিয়ট বিমানের লেজের দিকে কাহেগা নামে ফুর্তিবাজ কৃষ্ণকায় এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছিলো। পিটার ইলিয়ট ডকটর, ক্যারেনও ডকটর, কাহেগা ভেবেছিলো এরা বুঝি মানুষের ডাক্তার এবং এটা বুঝি একটা মেডিক্যাল মিশন এবং সেই মেডিক্যাল মিশনের আবরণে ওরা রাইফেল এবং কিছু যন্ত্রপাতি পাচার করছে। তাদের এই বিশ্বাস জন্মাবার কারণ হলো সঙ্গে

যে মানরো রয়েছে!

ক্যারেনকে পিটার জিজ্ঞাসা করলো, ওরা এতো হাসাহাসি করছে কেন?

ওরা হলো কিকিউ উপজাতি। হাসাহাসি করতে ভালোবাসে।

আমার মনে হয় ওরা ভাবছে যে আমরা মেডিক্যাল মিশনের আবরণে এই সব যন্ত্রপাতি এবং রাইফেলসগুলো পাচার করছি। আমি যতদূর জানি এই অঞ্চলে চায়নার প্রভাব খুব বেশি। নিউ চায়না নিউজ এজেন্সির প্রতিনিধি হিসেবে এখানে চায়নার অনেক এজেন্ট কাজ করছে তারা রাই-ফেল সম্বন্ধে যেমন আগ্রহী তেমনি আগ্রহী কমপিউটার যন্ত্রে। আমি এইরকম একটা প্রবন্ধ টাইম উইকলিতে পড়েছি।

এই সময়ে ক্যারেন প্লেনের জানালা দিয়ে মানরোকে ডাকতে গেল। সে জানত মানরো। পিটার লক্ষ্য করল ক্যারেনের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল সে যেন বিরক্ত।

কি হলো ক্যারেন?

তোমার অনুমান তো সত্য দেখছি। এদিকে দেখ।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পিটার দেখল মানরো জেট বিমান ডানার ছায়ায় চারজন চীনার সঙ্গে কথা বলছে। ওরা দুজনেই লক্ষ্য করল মানরো চীনাদের কয়েকটা প্যাকেট দিল কিন্তু প্যাকেটগুলো ওরা দুজনেই ভাল করে চেনে। ওগুলি হলো কিছু খাবারের প্যাকেট। আফ্রিকার স্বাদহীন ও একঘেয়ে খাবার খেয়ে নাকি অরুচি ধরে গেছে তাই এই সময়ে ঐ খাবারগুলি পেয়ে তারা খুশি হয়েছিল।

মানরোকে পরে প্রশ্ন করা হলে সে বলেছিল চীনাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্যেই সে ঐগুলি ওদের উপহার দিয়েছিলো কারণ চীনারা ইচ্ছে করলে এই অঞ্চলের উপজাতিদের তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিতে পারে।

সেই ১৯৬০ সালে থেকে চীনারা কঙ্গোয় যাওয়া আসা করছে। কঙ্গোয় শুধু যে ব্লু ডায়মণ্ড পাওয়া যায় তা নয় এখানে প্রচুর পরিমাণে ইউরে-নিয়ম ও অন্যান্য ধাতুও পাওয়া যায়। তাই অন্যান্য দেশের লোকের মতো চীনারাও এখানে যাতায়াত শুরু করেছে। চীনের আরও একটা উদ্দেশ্য,

রাশিয়া যেন এখানে নাক গলাতে না পারে।

এধারে কিছু জাপানীও আসা যাওয়া করছে। চীন এটাও পছন্দ করে না। জাপান তাদের আজীবন শত্রু। হাকামিচির মতলবের বিরুদ্ধে মানরো ঐ চীনা এজেন্টদের সজাগ করে দিয়েছিল। ঐ চীনাদের কাছে কিছু উৎকৃষ্ট ম্যাপ ছিল। খাবারের প্যাকেটের পরিবর্তে মানরো চীনাদের কাছ থেকে কয়েকখানা ম্যাপ সংগ্রহ করেছিল যা ওদের কাজে লাগবে।

ঠিক দুটো চব্বিশ মিনিটে ফোকার বিমান আকাশে উঠলো, নির্ধারিত সময়ের তিন মিনিট আগে।

রবাণ্ডার কিগালি শহর থেকে কিছু দূরে রবামাজেনা এয়ারপোর্টে ওদের বিমান নামল রাত্রি দশটায়। এখানে তেল ভরতে হবে। দু'জন ইনস্পেক্টর হাতে ক্লিপবোর্ড ও পেনসিল নিয়ে বিমান তদারক করতে এসে প্রশ্ন করলো, তোমরা কোথায় যাবে ?

ক্যারেন ও পিটারকে চুপ করতে ইসারা করে মানরো বলল, এখানে তেল নেবার জন্যে এসেছি। তেল ভরা হলেই আমরা ফিরে যাব।

দেন ইটস অলরাইট ; তাহলে ঠিক আছে। ও কে।

এয়ারপোর্টে যথোপযুক্ত পরিমাণে তেল ছিল না। তেল এসে পৌঁছতে দু'ঘণ্টা সময় লাগলো। তারপর তেল ভরে ওরা আবার আকাশে উঠলো।

ঘণ্টা পাঁচেক ওড়বার পর ভূ-দৃশ্য পালটে গেলো। গোমা পার হয়ে ওরা জেয়ারের সীমান্তে এসে পড়েছে। এখন ওরা বহু বিস্তৃত সেই রেন-ফরেস্টের পুব প্রান্তে এসে পড়েছে। জানালা দিয়ে পিটার বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগল। ঘন সন্নিবিষ্ট গাছের মাথায় এখানে ওখানে বোধহয় মেঘ জমে রয়েছে, নাকি কুয়াসা তুলোর মতো পুঞ্জীভূত হয়েছে ? মাঝে মাঝে গাছ ফুঁড়ে কর্দমাক্ত একটা নদী অথবা লাল রাস্তা দেখা যাচ্ছে। তার-পর শুধু গাছ আর গাছ, এত ঘন যে ওর ভেতর কলোনের বিশাল গির্জাটা লুকিয়ে রাখা যায়। এই দৃশ্য কিছুক্ষণ পরে একঘেয়ে মনে হলো।

মানুষ অনেক বড় বড় শহর তৈরি করেছে, দুর্দান্ত নদীর ওপর বিরাট পুল তৈরি করেছে কিন্তু শত শত মাইলের পর মাইল এমন ঘন অরণ্য আজও সৃষ্টি করতে পারে নি। এই অরণ্যের গাছগুলির উচ্চতা গড়ে দু'শো ফুট এবং গুঁড়ির পরিধি চল্লিশ ফুট। পুব থেকে পশ্চিমে সেই আটলান্টিকের ধার পর্যন্ত এই অরণ্য দু'হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।

পিটারের মতো টাই-টাইও জানালা দিয়ে এই অরণ্য দেখছিল। পিটার সংকেতিক নির্বাক ভাষায় জিজ্ঞাসা করলো, টাই-টাই বন ভালো লাগছে ?

টাই-টাই-এর মুখে চোখে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। সে শুনে বললো, বন এখানে বন ওখানে টাই-টাই বন দেখছে।

টাই-টাই তুমি বনে থাকবে ?

টাই-টাই টাই-টাই-এর ঘরে থাকবে, টাই-টাই উত্তর দিল। টাই-টাই তার সিটবেল্ট আলগা করে গালে হাত দিয়ে বসে বললো, টাই-টাই সিগারেট চায়।

পিটার বললো, এখন সিগারেট নয়।

পরদিন সকাল সাতটার সময় যখন ওরা মাইসিসির টিন ও ট্যান্টালাম খনির উপনিবেশের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল তখন যে ঘটনাটা ঘটলো সেজন্যে ওরা প্রস্তুত ছিলো না।

প্লেনের পিছন দিকে কাহেগা ও তার লোকজন সোল্লাসে নিজেদের মধ্যে সোয়াহিলি ভাষায় কথা বলতে বলতে সাজ-সরঞ্জাম প্যাক করছিল। টাই-টাই সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তারপর পিটারকে ইসারায় বললো, ওরা বিপদ ভাবছে।

কি বিপদ ভাবছে টাই-টাই ?

টাই-টাই সেই একই কথা বললো, লোকেরা বিপদ ভাবছে বিপদ।

টাই-টাই-এর কথা ভাবতে ভাবতে পিটার বিমানের পিছন দিকে গিয়ে দেখলো কাহেগার লোকেরা টর্পেডো আকারের একরকম পাত্রের ভেতরে যন্ত্রপাতি ঢুকিয়ে তারপর সরু সরু পাইন কাঠ ছোলা যন্ত্রগুলির চারদিকে

বেশ করে ঠেসে দিচ্ছে যাতে যন্ত্রগুলি নড়তে না পারে।
পাত্রগুলি দেখিয়ে কাহেগাকে পিটার জিজ্ঞাসা করলো। এগুলো কি ?
এগুলো হলো ক্রসলিন কণ্টেনার, ভারি মজবুত।
টাই-টাইও পিটারকে অনুসরণ করে এসেছিল। সে পিটারকে ইসারায় বললো, নাকচুলো মানুষ মিছে কথা বলেছে।
নাকচুলো মানুষ হলো মানরো, তার নাকে চুল আছে। পিটার ওর কথায় কান না দিয়ে কাহেগাকে জিজ্ঞাসা করলো, মুকেংকো এয়ারফিল্ড আর কতদূর ? এয়ারফিল্ড ? মুকেংকো এয়ারফিল্ড ? তারপর কাহেগা কি যেন ভেবে আন্দাজে বললো, ঘণ্টা দুয়েক হবে হয়তো। কথাটা বলে সে কিন্তু হাসতে লাগলো। তারপর সে সয়াহিলি ভাষায় তার লোকেদের কিছু বলতে তারা সবাই হো হো করে হেসে উঠল। হাসির কারণ কি ?
পিটার বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সে অনুমান করলো, এরা ভাবছে আমরা চোরা-চালানকারী। এইসব মালপত্তর কোথাও আকাশ থেকেই ফেলে দোব। কঙ্গোয় যারা লড়াই করছে এগুলো তাদের কাজে লাগবে, তাই এত হাসাহাসি।
তবুও পিটার কাহেগাকে প্রশ্ন করলো, তোমরা এত হাসছ কেন ?
ডক্টর যেন কিছু জানেন না, কাহেগা বললো।
এই সময় প্লেনটা আকাশে একটা চক্কর দিল কেন কে জানে। কাহেগা জানালা দিয়ে নিচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। পিটারও জানালা দিয়ে নিচের দিকে চাইল। মাইলের পর মাইল শুধু গাছ আর গাছ ওরই ফাঁকে দেখা গেল এক সার সবুজ রঙের জিপ ধীর গতিতে কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে। জিপগুলো নিশ্চয় মিলিটারির।
পিটার শুনতে পেল কাহেগা কয়েকবার 'মুগুরু' শব্দটা উচ্চারণ করলো।
মুগুরু কি ? ব্যাপারটা কি বলো তো, পিটার জানতে চায়।
কাহেগা জোরে ঘাড় নেড়ে বলতে লাগলো, পাইলট ব্যাটা নিশ্চয় দিক ভুল করেছে। মুগুরু কি তা সে বললো না।
প্লেনখানা পুব দিকে গাছভর্তি একটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে উড়ে চললো।

কাহেগার লোকেরা দারুণ উল্লসিত, এক একজনকে চাপড়াতে লাগলো। তারা যা আশা করছে তা বুঝি এখনি ঘটবে।

ক্যারেন সেখানে এসে একটা বড় কার্ডবোর্ডের বাক্স খুলে তার ভেতর থেকে ফুটবলের সাইজের বড় বড় কয়েকটা ধাতু নির্মিত বল বার করলো। ওগুলো কি হবে ?

পিটারের প্রশ্ন শেষ হতে না হতেই প্লেনের নিচে কি ফাটলো? বেশ জোর আওয়াজ। তারপরই ধোঁয়া। আরও দুটো আওয়াজ হলো। প্লেন কাত হয়ে গতি বাড়িয়ে খানিকটা যেয়ে ওপরে উঠতে লাগলে।

মানরো বললো, নিচে থেকে রকেট ছুঁড়ছে, মিসাইল, ওরা ভুল করেছে। আমাদের ভাগ্য ভাল যে রকেটগুলো পুরনো হয়ে গেছে, আমাদের প্লেন আঘাত করবার আগেই ফেটে যাচ্ছে।

ক্যারেন বললো, ভুল করেছে তো ওদের জানিয়ে দাও যে আমরা শত্রু-পক্ষের কেউ নই। ওরা কারা ?

জেয়ার আর্মি কিন্তু আমি ওদের কিছু জানাতে চাই না, আমরা তো এধার দিয়ে বেআইনীভাবে উড়ে চলেছি। এই বেআইনী ব্যাপারটা ওদের খাতায় লেখা হয়ে যাবে। যাইহোক এখন আমরা ওদের পাল্লার অনেক দূরে চলে এসেছি।

ক্যারেন রসের মেজাজ ভাল নেই। সে ভীষণ চিন্তিত। ইউরো-জাপানিজ কনসরটিয়ম ওদের চেয়ে আঠারো ঘণ্টা কুড়ি মিনিট এগিয়ে আছে। নাই-রোবিতে মানরো একটা প্ল্যানের কথা বলেছিল। ওর প্ল্যানমতো কি একটা খরস্রোতা নদী দিয়ে গেলে ওরা কনসরটিয়মের চল্লিশ ঘণ্টা আগে যেতে পারবে। সেজন্যে তাদের মুকেংকো পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের ঢালুতে প্যারাশুটে করে নামতে হবে। এই প্ল্যানের কথা ক্যারেন পিটারকে বলে নি।

যেখানে ওরা নামবে সেখান থেকে জিঞ্জ পৌঁছতে মোট ছত্রিশ ঘণ্টা লাগবে। বেলা দুটোয় ওদের নামবার কথা অবশ্য যদি মেঘের অবস্থা অনুকুল হয়। সব ঠিকঠাক হলে এরা ১৯ জুন দুপুরে জিঞ্জ শহরে পৌঁছে যাবে।

প্ল্যানটা বেশ বিপজ্জনক। মানরো আর কাহেগা ছাড়া বিমান থেকে আর কেউ কখনও প্যারাশুটে করে নামে নি। নিচে ঘোর জঙ্গল, কি বিপদ লুকিয়ে আছে কে জানে? নিকটতম শহর হাঁটাপথে তিন দিন। যদি কেউ জখম হয় তাকে শহরে চিকিৎসার জন্যে পাঠানই যাবে না হয়তো। তাছাড়া যন্ত্রপাতিগুলোও এয়ারড্রপ করার সমস্যা আছে। ক্রসলিন কণ্টেনার খুব মজবুত শুনেছে কিন্তু এই কণ্টেনার কতটা মজবুত তা তার জানা নেই।
ক্যারেন প্রথমে মানরোর এই প্ল্যান বাতিল করেছিল কিন্তু মানরো জোর দিয়ে বলে তোমরা যত বিপজ্জনক মনে করছ এ রাস্তা তত বিপজ্জনক নয়, বিপদ তো সর্বদা আমাদের পায়ে পায়ে ঘুরছে তা বলে কি চুপ করে বসে থাকতে হবে নাকি? মানরো আরও সাহস দিয়ে বললো, প্যারাশুটকে অত ভয় পাবার কিছু নেই। আমরা বলি প্যারাফয়েল, ওগুলোতে অটো-ম্যাটিক ব্যবস্থা আছে আর পাহাড়ের ঢালুতে যেখানে নামবে সেখানে ভলক্যানোর ছাইয়ের পুরু আস্তরণ থাকায় মনে হবে যেন বালির গাদায় নামলুম। টাই-টাই? তার দায়িত্ব আমি নোব, তাকে নিয়ে আমি নিজে প্যারাফয়েল ড্রপ করব। যন্ত্রপাতি? আমাদের ক্রসলিন প্যাক খুব মজবুত, ওগুলো উত্তমরূপে বার বার টেস্ট করা হয়েছে।
ক্যারেন শুধু মানরোর কথায় বিশ্বাস করে নি। সে সমস্ত প্রকল্পটা তার কমপিউটারে যাচিয়ে নিয়েছিল। কমপিউটার জানিয়ে দিল, বিপদ ঘটতে পারে তবে তার আশংকা নগণ্য। কনসরটিয়মের আগে পৌঁছবার দ্বিতীয় কোনো প্ল্যান না পাওয়ায় ক্যারেন মানরোর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল, বললো, ঠিক আছে, আমরা লাফাবো। ক্যারেন লেভিন আর জেনসেনের অভাব এই সময়ে অনুভব করছিল। তাদের সাহস আছে। তারা তাকে সাহস যোগাতে পারতো। একটা গোরিলার মোকাবিলা করলে কি হবে পিটারের সাহস নেই। প্যারাশুট ড্রপ করতে হবে শুনলেই সে হয়তো ভীষণ নারভাস হয়ে পড়বে।
ক্যারেন আরও বিচার করে দেখলো যে প্যারাশুট ড্রপ করে নদীপথে গেলে অন্য কিছু বিপদ এড়ানো যায়। উপজাতি কিগানিরা এখন বিদ্রোহ

করেছে, তারা চারদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, এধারে যে সব পিগ্‌মি আছে তাদের ওপর সর্বদা নির্ভর করা যায় না, ওদের বিষাক্ত তীর অবহেলা করার মতো নয়, কিগানিদের বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে জেয়ার আর্মি পুব দিকে ছুটে আসছে, তারা যত্রতত্র গুলি চালাতে ভালবাসে। প্যারাশুট ড্রপ করলে এসব বিপদও এড়ানো যাবে।

এদিকে আর এক বিপদ হয়েছে। ইউস্টনে ট্রেভিসের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে। ক্যারেনের কমপিউটার স্যাটেলাইটের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারছে না, তার ধ্বনতরঙ্গ কেউ জ্যাম করছে। এ নিশ্চয় হাকামিচির কাজ। হাকামিচি ছাড়া উন্নত ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র আর কার কাছে থাকবে? ক্যারেন যেন মনে জোর পাচ্ছে না।

মানরো সাহস দিয়ে বললো, অত হতাশ হবার কি আছে? এই নাও একটু হুইস্কি খাও। আমি আমার লোকদের রেডি হতে বলেছি। ওরা প্যারা-শুটগুলো সাজাচ্ছে। তারপর যন্ত্রপাতি সমেত ক্রসলিন কণ্টেনারগুলো রেডি করবে। কোনো ভয় নেই, অও সাকসেস, বলে মানরো হুইস্কির গেলাস তুলে ধরলো।

হুইস্কি খেয়ে ক্যারেন সত্যিই যেন একটু জোর পেলো। সে বললো সকলকেই হুইস্কি দিতে। হুইস্কির বোতল হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। ব্যাপার কি? এত হইহুল্লোড় কেন? টাই-টাই-এর কাছ থেকে উঠে এসে প্রশ্ন করলো পিটার ইলিয়ট।

আমরা এবার হাঁটবো, মানরো বললো।

হাঁটবো? তাহলে প্লেন ল্যাণ্ড করবে? এয়ারফিল্ড কোথায়?

এখানে জঙ্গলের মধ্যে আবার এয়ারফিল্ড কোথায়? পিঠে প্যারাশুট বেঁধে লাফ মারবো।

লাফ মারবো শুনেই পিটারের হয়ে গেল। সে যেন আর নিজের মধ্যে নেই। তবুও সে বললো, আমার জন্যে ভাবি না কিন্তু টাই-টাই? তার জন্যে আমার ভাবনা। ও যদি মরে যায় তাহলে আমি যে জন্যে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এত দূরে এলুম সে সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

মানরো তুমি ভাবছ কেন? ওকে তুমি থোরালেন ট্র্যাংকুইলাইজার ইঞ্জেকশন দিয়ে দিয়ো, আমি ওকে নিয়ে ঠিক নেমে যাব।

ক্যারেন এবং পিটারের জন্যে দুটো প্যারাশুট বা মানরোর ভাষায় প্যারা-ফয়েল এনে মানরো ওদের সব কিছু বুঝিয়ে দিল। বুকের দিকে অটো-ম্যাটিক অলটিমিটার আছে। পড়বার সময় অলটিমিটার ফুট মাপতে থাকবে এবং কত হাজার ফুট বাকি থাকতে প্যারাশুটের ফাঁশ টানতে হবে তাও দেখিয়ে দিল। দুদিকে দুটো ফাঁশ আছে যেটা ইচ্ছে টানতে পারো। কোনো ভয় নেই, প্যারাশুট খুলে গেলে নামতে মজা লাগবে।

পিটারের তখন ঘাম দিচ্ছে। ওদিকে তখন সকলকার প্যারাশুট লাগানো হয়ে গেছে। মানরো, ক্যারেন ও ইলিয়টকে প্যারাশুট লাগিয়ে দিল। পিটার ইলিয়টের বুক ঢিপ ঢিপ করছে।

আগে লাফালো কাহেগা ও তার লোকেরা। তারপর ক্যারেন। পিটার বললো, আমি তো প্যারাশুট ল্যাণ্ডিং করি নি, কি করে করবো?

এই রকম করে, বলে মানরো তাকে খোলা দরজা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিল। সবশেষে সে নিজে টাই-টাইকে নিয়ে লাফ দিল।

প্লেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যজগতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হলো, নিচে বারাওয়ানার গভীর অরণ্য সেখানে কি আছে কে জানে। মানরো তো তাদের বুঝিয়েছে যে তারা ভলক্যানোর ছাইগাদার ওপর নামবে কিন্তু সত্যিই কি সেখানে ছাইগাদা আছে?

সব প্রথমে নামল কাহেগা তারপর তার লোকজন। তারপর ক্যারেন। পিটারও নামল কিন্তু সে আবিষ্কার করলো যে তার পা মাটি স্পর্শ করতে আর মাত্র ফুট চারেক বাকি আছে কিন্তু প্যারাশুট তো আর নামছে না? আসলে প্যারাশুট একটা লম্বা গাছে আটকে গেছে। কোনোরকমে প্যারাশুটের স্ট্র্যাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল।

সব শেষে নামল মানরো টাই-টাইকে নিয়ে। টাই-টাই তার একটা কান কামড়ে রক্ত বার করে দিয়েছে। পিটার ছুটে গিয়ে টাই-টাইকে জড়িয়ে

ধরল। টাই-টাই নির্বাক ভাষায় জানিয়ে দিল, টাই-টাই ওড়া ভালো লাগে না।

ক্রসলিন কণ্টেনারগুলি প্লেন থেকে পাইলটের সহকারীরা নামিয়ে দিতে আরম্ভ করেছে। সেগুলিও একে একে মাটিতে পড়তে লাগলো। আশ্চর্য! কয়েকটা ক্রসলিন ফেটে গেলেও ভেতরে মালপত্তরের কোনো ক্ষতি হয় নি। কাহেগার লোকজন ক্রসলিনের ভেতর থেকে মালপত্তর বার করে নিল। সবই প্যাক করা ছিল।

কফি তৈরি করে ও ভিটামিন বিসকুট খেয়ে কুড়ি মিনিটের মধ্যে লাইন বেঁধে যাত্রা। অরণ্যে প্রবেশ করে ইলিয়টের মনে হলো সে যেন স্ট্যানলি, লিভিংস্টোনের খোঁজে চলেছে! এখনও দু'শো মাইল বাকি।

গাছে গাছে পাখি ডাকছে বাঁদর কিচিমিচি করছে। পিটার কিন্তু চেষ্টা করে একটাও বাঁদর দেখতে পেলো না। বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। এখনও গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ প্রবেশ করছে, আরও ভেতরে ঢুকলে হয় তো অন্ধকার। ক্যারেনকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

ক্যারেনের কাঁধে ঝুলছে একটা ইলেকট্রনিক বক্স, হাতেও একটা রয়েছে। চলতে চলতেই সে কাঁটা ঘুরিয়ে আটলান্টিকের ওপারে সুদূর অ্যামেরিকার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছে।

মানরো বললো, কি? বন ভালো লাগছে? তবে আর একটু পরে আর ঠাণ্ডা বাতাস পাবে না।

বারওয়ানা কুমারী অরণ্য নয়। মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আদিবাসী-রাই এখানে ওখানে বস্তি বেঁধেছে। বনই ওদের খাদ্য যোগায়।

দুপুর নাগাদ সকলেই বেশ ক্লান্ত এমন কি কুলিরাও। তাদের মুখে এখন কোনো কথা নেই। পিটারের বেশি হাঁটা অভ্যাস নেই, পায়ে লাগছে। ক্যারেনের গরম লাগছে, তার ইচ্ছে করছিলো সে শুধু হাফ প্যাণ্ট আর গেঞ্জি গায়ে দিয়ে চলে কিন্তু নানারকম পোকা ও মশার ভয়ে দেহের কোনো অংশ উন্মুক্ত রাখা নিরাপদ নয়।

পিটার বললো, এই তো এই জায়গাটা ফাঁকা। বড়ো একটা গাছও

রয়েছে, আকাশ দেখা যাচ্ছে, এইখানেই লাঞ্চ সেরে নেওয়া যাক।

মানবো বললো, এখন নয়। আকাশে কিসের শব্দ। হেলিকপ্টার আসছে যেন? কাহেগা ও তার লোকজন ততক্ষণে বড়ো গাছের ডালপালার আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে। এরকম করতে তারা অভ্যস্ত। ওরা তিনজনও গাছের আড়ালে সরে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পরে সবুজ রঙের দুটো হেলিকপ্টার চলে গেল। দূরবীন লাগিয়ে মানরো হেলিকপ্টারের গায়ে এফ. জেড. এ. তিনটে অক্ষর চিনতে পারলো অর্থাৎ জেয়ার আর্মির হেলিকপ্টার।

মানরোই বললো, ওরা কিগানি বিদ্রোহীদের খুঁজছে। চল ওঠা যাক, এখানে বসে থেকে লাভ নেই।

আরও ঘন্টাখানেক হাঁটবার পর ওরা একটা পরিষ্কার জায়গায় এলো। গাছ কেটে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে। ছোট একটা ক্ষেত, ট্যাপিওকা জাতীয় গাছের চাষ করা হয়েছে, পাশেই একটা কুটির। কুটিরের চাল ফুঁড়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। বাইরে দড়িতে কয়েকটা কাপড় শুকোচ্ছে। কিন্তু কোনো মানুষ দেখা গেল না।

আগেও পথে এরকম ফার্মহাউস পড়েছে, সেখানে ওরা থামে নি কিন্তু এবার মানরো ওদের থামতে বললো। মানরো বললো, কেউ কথা বোলো না, সবাই গাছ বা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাক। মালগুলোও লুকিয়ে রাখ।

সকলে মানবোর আদেশ পালন করলো। কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করার পরও যখন কিছু দেখা গেল না তখন ক্যারেন জিজ্ঞাসা করলো, ব্যাপারটা কি? আমাদের থামিয়ে··· । তার কথা শেষ করতে না দিয়ে মানরো তার মুখে চাপা দিয়ে বললো, কিগানি।

ক্যারেন ও পিটারের চোখ বড় বড় হলো। পিটার শুনেছে কিগানিরা নাকি মানুষ খায়। ক্যারেন ইসারা করে বললো, চলো না আমরা পাস কাটিয়ে চলে যাই। মানরো হাত নেড়ে নিষেধ করলো।

ভয় ছিলো টাই-টাইকে কিন্তু সে বোধহয় অবস্থা উপলব্ধি করে চুপ

করে বসেছিল। কোনো শব্দই করছিলো না, শুধু সে মাঝে মাঝে ফার্ম হাউসের দিকে চেয়ে দেখছিল।
চারদিক নিস্তব্ধ। কাছে বোধহয় কোথাও ঝর্না আছে, জলের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বাতাস বইছে। কাহেগা ও তার লোকজন ব্যাপারটা বুঝলেও পিটার ও ক্যারেন বুঝতে পারছিল না। কিগানি যে ভেতরে আছে তা মানরো বুঝলো কি করে? ততক্ষণে তো ওরা মাইলখানেক চলে যেতে পারতো, ওরা তো নিরস্ত্র নয়। কটা কিগানিই বা থাকতে পারে?
আরও কয়েকটা মিনিট কেটে গেল। কুটিরের চাল ভেদ করে যে ধোঁয়া বেরুচ্ছিলো তা থেমে গেল। মানরো ও কাহেগা দৃষ্টি বিনিময় করলো। কাহেগা আগেই একটা লাইট মেসিন গান বার করে রেখেছিল এখন সেটা তাক করে রাখলো।
ক্যাঁচ করে দরজা খোলার আওয়াজ হতেই মানরো মেসিন গানটা তুলে নিলো। কয়েক সেকেণ্ড পরে পর পর বারোটা মানুষ বেরিয়ে এলো। বেশ পেশীবহুল চেহারা, সঙ্গে তীর ধনুক ও হাতে বেশ বড় ও ধারালো চপার যার এক কোপে একটা গলা উড়ে যাবে। মাথা ন্যাড়া। ওরা সারবন্দিভাবে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে ট্যাপিওকা ক্ষেতের ভেতর দিয়ে চলে গেল। মুখে ওরা সাদা রং লাগিয়েছে। দেখলে ভয় লাগে, মনে হয় যেন কালো দেহের ওপর একটা মাথার খুলি বসানো রয়েছে।
কিগানিরা বেশ খানিকটা চলে যাবার পরও মানরো আরও দশ মিনিট কাউকে উঠতে দিল না। তারপর বললো ওরাই হলো খাঁটি কিগানি, কুঁড়ের মধ্যে বসে ওরা মানুষ রান্না করে খাচ্ছিল। কুঁড়ের মধ্যে যারা ছিল তাদের হত্যা করে ওরা খেয়েছে। কেন? এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা কোনো গন্ধ পাও নি? চলো এবার যাওয়া যাক।
পিটার জিজ্ঞাসা করলো, গতকাল তোমার লোকেরা মুরুগু মুগুরু বলে চিৎকার করেছিল কেন?

মুগুরু হলো জেনারেল জো মুগুরু, কিগানিদের চিরশত্রু আবাউই উপ-জাতিভুক্ত। জেয়ার সরকার তার ওপর ভার দিয়েছে কিগানি বিদ্রোহ দমন করে কিগানিদের নিশ্চিহ্ন করতে। প্লেন থেকে যে জিপ দেখা গিয়েছিল সেই জিপগুলো মুগুরুর, তাই আমার লোকেরা মুগুরু বলে চেঁচামেচি করছিলো।

চলতে চলতে ও পাহাড়ের নিচে বা দূরে কয়েকটা কিগানি বস্তি দেখতে পেয়েছিল। মাঝে মাঝে দূরে মর্টার ছোঁড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। বিকেল নাগাদ ওরা মোরুভি গর্জের ওপর দিয়ে কাঠ ও লতা দিয়ে তৈরি একটা ঝোলা পুল দুলতে দুলতে পার হলো। ওপারে পৌঁছে মানরো বললো, কিগানি রাজ্য পার হওয়া গেল, আপাততঃ আমরা নিরাপদ।

ওপারে যাবার পর খানিকটা হেঁটে ওরা একটা পাহাড়ের মাথায় এলো। জায়গাটা বেশ পরিষ্কার, গাছপালা কম। নিচে রেনফরেস্ট দেখা যাচ্ছে। মানরো কুলিদের আদেশ দিলো, মাল নানাও।

ক্যারেন বললো, কেন ? এখন তো পাঁচটা বেজেছে, এখনও দু'ঘণ্টা আলো পাবো। হাঁটা যাক।

মানরো বললো, না, আরও দু'ঘণ্টা চললে আমরা রেনফরেস্টে পৌঁছে যাব। রেনফরেস্টে আমরা রাত কাটাতে চাই না। এজায়গাটা হাজার দুই ফুট উঁচু, বেশ ঠাণ্ডা। রাত্রে রেনফরেস্টে থাকা অনেক ঝামেলা। বিশেষ করে জোঁকের উৎপাত, ওরা যে কোথা দিয়ে রক্ত চুষতে আরম্ভ করে কে জানে। তাছাড়া আরও অনেক অসুবিধে আছে।

তাহলে তাঁবু খাটাতে বলো, ক্যারেন বললো।

এই অভিযানের তাঁবু আরিটেসা বিশেষভাবে তৈরি করেছে। সবই নাইলনের, হালকা এবং সহজে খাটানো ও তোলা যায়। শুধু তাঁবু নয়, অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই অনেক জল্পনা-কল্পনা করে বিশেষভাবে তৈরি। এমন কি পোর্টেবল এয়ার-কণ্ডিশনারও এমন ভাবে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে যা সহজে বহন ও ব্যবহারযোগ্য।

তাঁবু যখন খাটানো হচ্ছে ক্যারেন তখন তার ট্রান্সমিট করার সব যন্ত্রপাতি

খাটাতে আরম্ভ করেছে। এই সময়টা টাই-টাই খুব মজা অনুভব করে, বেশ মেজাজে থাকে।

যদিও এই ট্রান্সমিটারের সাহায্যে দশ হাজার মাইল দূরে ইউস্টনের সঙ্গে বার্তা আদান প্রদান করা যায় এবং ছবি পাঠানো যায় ও এধারে কম-পিউটার স্ক্রীনে ইউস্টন থেকে প্রেরিত বার্তা ফুটে ওঠে তথাপি এসবের মোট ওজন মাত্র চার কিলোগ্রাম। আনুষঙ্গিক কয়েকটা যন্ত্রেব ওজন মাত্র দেড় কেজি।

প্রথমেই পাঁচ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট ছাতার মতো সিলভার ডিশ অ্যান্টেনাটা খাটাতে হয়। টাই-টাই এটাকে বলে মেটাল ফ্লাওয়ার, তারপব ট্রান্সমিটার বক্স যা ক্রাইলন ক্যাডমিয়ম ফুয়েল সেল-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং এগুলি যুক্ত করা হয় মিনিয়েচার কমপিউটার স্ক্রীনের সঙ্গে।

এই মিনিয়েচার কমপিউটার ও তাব তিন ইঞ্চি ভিডিও স্ক্রীন দারুন সূক্ষ্ম। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তৈরি করা হয়েছে।

যন্ত্রপাতি খাটানো হলো। কি-বোর্ড টিপে সেটি চালু করা হলো। কিন্তু কেউ জ্যাম করছে। নিশ্চয় হাকামিচিব অপারেটব এই কীর্তি করছে কিন্তু এই জ্যাম ক্যারেন কাটাতে পারলো।

ইউস্টনের সঙ্গে যোগাযোগ হলো। ইউস্টন জানালো হাকামিচির দল পেছিয়ে পড়েছে। গোমা এয়ারফিল্ডে ওরা আটকে গিয়েছিল।

ক্যারেন ভাবলো, মানরো যে রাস্তা দিয়ে যাবার প্ল্যান করেছে ওরা সেই রাস্তা দিয়েই যাবে এবং অন্তত দুদিন আগে ওরা জিঞ্জ শহরে পৌছে কাজ সেরে হাকামিচির দলের আগেই ফিরতে পারবে। কিন্তু ফিরবে কি করে? ওদের প্লেন কোথায় অপেক্ষা করবে? মানরো জানে বোধহয়।

পরদিন সকালে ওরা কঙ্গোর রেনফরেস্টে প্রবেশ করলো। ক্যারেন নিজের চিন্তায় বিভোর, কখন সে পৌছবে জিঞ্জ শহরে, কখন সে খুঁজে পাবে ব্লু ডায়মণ্ড আর হাকামিচির দলের আগে সেখানে সে পৌছবে কি করে?

কিন্তু পিটারের মনে ভিন্ন অনুভূতি। অ্যামেরিকার কয়েকটা অরণ্যে সে ঘুরে বেড়িয়েছে কিন্তু সে অরণ্য অনেক পরিষ্কার, অনেক নিরাপদ, আলো প্রবেশ করে। সবই প্রায় পাইন গাছ, অরণ্যের ভেতর দিয়ে রাস্তা আছে, জিপ চলে। কিন্তু আফ্রিকার এই অরণ্যের চরিত্রই আলাদা। তার গা শির-শির করতে লাগলো, ভিন্ন একটা অনুভূতি। বিরাট সব গাছ যাদের গুঁড়ির ব্যাস চল্লিশ ফুট পর্যন্ত। গোড়ায় শ্যাওলা জমেছে কিংবা প্রচুর মাশরুম। অন্ধকার, কোথাও ক্বচিৎ এক ফালি রোদ প্রবেশ করে। তার মনে হচ্ছিল সে যেন বিশাল একটা গির্জার ভেতরে ঢুকেছে যেখানকার আলোগুলো সব নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পিটার মনে করেছিল এই গভীর বনের ভেতর দিয়ে বোধহয় হাঁটা মুশকিল হবে, নিচে নিশ্চয় অনেক ছোট ছোট গাছ বা কাঁটাঝোপ থাকবে কিন্তু আশ্চর্য ছোট জাতের গাছ প্রায় অনুপস্থিত, সূর্যালোকের অভাবে ছোট গাছ বোধহয় বাঁচে না। তবে ময়াল সাপের মতো বড় গাছের শেকড় মাটির ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। এই শেকড়গুলো চলার অসু-বিধে সৃষ্টি করছিলো। কাহেগার লোকেরা অভ্যস্ত, তাদের কোনো অসুবিধে হচ্ছিলো না।

সে আরও অনেক কিছু আশা করেছিল কিন্তু সে সব অনুপস্থিত। তবে বনের ভেতরে ভীষণ গরম, ভ্যাপসা গরম, গা দিয়ে, দরদর করে ঘাম ঝরছে। বনে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে টাই-টাই-এর মেজাজ পালটে গেল, সে যেন তার নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে। সে এখন একাই বনের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেখানে ঘাস পাতা পাচ্ছে চিবিয়ে খাচ্ছে, কোথাও বা শুয়ে পড়ছে, মাঝে মাঝে দল ছেড়ে চলে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। সে বুঝি আবার গোরিলা হয়ে গেছে।

পিটারের ভয় হচ্ছে এই গভীর অরণ্যে টাই-টাই বুঝি হারিয়ে যাবে কিন্তু মানরো বললো, সে ঠিক ফিরে আসবে, এই বনে গোরিলা নেই যে টাই-টাই তাদের দলে ভিড়ে যাবে বা অপর গোরিলারা তাকে আটকে রাখবে।

কিকিউ কুলিরা মাল বয়ে নিয়ে চলেছে। কখনও চুপচাপ আবার কখনও হইহুল্লোড়। তাদের একটাই আশংকা। হাতির পাল না এসে পড়ে নইলে তারা বেশ মজাতেই আছে।

বনের মধ্যে কোথাও সামান্য একটু ফাঁক দেখলে ক্যারেন তার পোর্টেবল ট্রান্সমিটারের সাহায্যে ইউস্টনের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজেদের খবর দিচ্ছে, ঘড়ি মিলিয়ে নিচ্ছে, হাকামিচির খবর জিজ্ঞাসা করছে।

হঠাৎ মেঘগর্জন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। গাছের ওপর ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, আওয়াজ শোনা যাচ্ছে কিন্তু তখনও বৃষ্টির জল তাদের গায়ে পৌঁছল না, গাছের পাতা বৃষ্টি আটকে দিচ্ছে। বৃষ্টির জল পৌঁছল কিছু পরে এবং ওদের ভিজিয়ে দিলো।

বৃষ্টি যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাতই থেমে গেল। মানরোও থামবার আদেশ দিল। ক্যারেন আপত্তি করলো না। ওদের সকলের পায়ে কখন জোঁক ঢুকে রক্ত চুষতে আরম্ভ করেছিল ওরা টের পায় নি। এখন সিগারেটের আগুন ছুঁইয়ে সেগুলোকে মারতে লাগল। বৃষ্টির পর জোঁকের উৎপাত বাড়ে।

কুলিরা মাল নামিয়েই খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ করে দিয়েছে। ওদের সঙ্গে পুঁটলিতে বাঁধা খাবার থাকে।

মানরো ইলিয়ট ও রসকে বলছে জোঁক কখনও টেনে ছাড়াবে না কারণ ওদের মাথাটা ছিঁড়ে গিয়ে গায়ে আটকে থাকলে রক্ত দূষিত হয়ে যায়, অসুখ করে। মানরো হঠাৎ চুপ করে গেল। কি যেন শুনছে।

এই সময় কাহেগা ওদের খাবার নিয়ে আসতে মানরো ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার লোকেরা ঠিক আছে তো? ভয় পায় নি?

না, ওরা ঠিক আছে।

মানরোর কথা বলার ধরন দেখে পিটারের কি রকম সন্দেহ হলো, সে জিজ্ঞাসা করলো, কিসের ভয়?

মানরো বললো, কোনো দিকে চেয়ো না, ওরা অপমানিতবোধ করবে, নিজের মনে খেতে থাক।

পিটার তবুও এদিক ওদিক চাইতে লাগলো। মানরো বিরক্ত হয়ে বললো আঃ নিষেধ করলুম না, ওরা যে এখানে এসেছে এ যেন আমরা জানি না. যেমন খাচ্ছ খেয়ে যাও।

ব্যাপারটা কি পিটার ও ক্যারেন একটু পরে বুঝতে পারলো। গাছের আড়াল থেকে একজন পিগমি বেরিয়ে এলো। খুব বেশি কালো নয়, সাড়ে চার ফুট মতো লম্বা হবে, কাঁধে ঝুলছে তীর ধনুক। তীরের ধারালো ডগাগুলোর রং বাদামী, তীব্র বিষ মাখানো থাকে।

মানরো উঠে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে অন্য একটা ভাষায় কথা বলতে লাগলো। পিগমি উত্তর দিলো। মানরো তাকে একটা সিগারেট দিলো। পিগমি সিগারেট না ধরিয়ে রেখে দিলো। পিগমি জঙ্গলের ভেতরে এক দিকে আঙুল দেখিয়ে কি বললো। সঙ্গীদের মানরো বললো:

ও বলছে ওদের গ্রামে একজন সাদা মানুষ মরেছে, ও আমাদের বলছে ওর সঙ্গে যেতে।

ক্যারেন বললো, ওর সঙ্গে যাওয়া মানেই তো আমাদের কয়েক ঘণ্টা দেরি হয়ে যাবে তাছাড়া লোকটাতো মরেই গেছে।

মানরো বললো, না, একেবারেই মরে নি। পিগমিদের বিশ্বাস অনুসারে একটা লোক প্রথমে গরম হয়, তারপর তার জ্বর হয়, তারপর অসুখ হয়, তারপর সে মরে, তারপর একেবারেই মরে এবং শেষে চিরদিনের জন্যে মরে অতএব সেই সাদা মানুষ এখনও বেঁচে আছে।

ইতিমধ্যে আরও তিনজন পিগমি প্রথম পিগমির সঙ্গে যোগ দিয়েছে। মানরো পিটারকে বললো ওদের তিনজনকে সিগারেট দিতে। মানরো বললো, এরা কখনও একা ঘুরে বেড়ায় না, সর্বদা দল বেঁধে। এদের মান অপমান জ্ঞান খুব তীক্ষ্ণ, আমরা যদি কিছু ভুল করি ওরা আমাদের দিকে তীর ছুঁড়তে ভুল করবে না।

টাই-টাই এতক্ষণ দলে ছিল না, কোথা থেকে এসে পিটারের কাঁধে হাত রাখলো। প্রথম পিগমি মানরোকে কি জিজ্ঞাসা করলো। মানরো উত্তর দিতে লাগলো। পরে সঙ্গীদের বললো, ওরা জিজ্ঞাসা করছে গোরিলাটা

কি তোমার মানে পিটারের, আমি বললুম, হ্যাঁ, তারপরও প্রশ্ন করলো পিটারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে কি না, আমি বলেছি না কোনো রকম সম্পর্ক নেই। ওরা জানতে চাইছিল সেকস্যুয়াল সম্পর্ক আছে কি না। নেই জেনে বলেছে, গুড কিন্তু ওরা সতর্ক করে দিচ্ছে, গোরিলার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়া ভালো নয়, ওরা কষ্ট দেয়, হয় ছেড়ে বনে চলে যায় আর নয়তো পালককেই মেরে ফেলে।

ক্যারেন কিন্তু ফিস ফিস করে মানরোকে তাগাদা দিচ্ছে, এখানে সময় নষ্ট করছ কেন? এদিকে আমরা যত দেরি করবো ওদিকে পৌঁছতেও আমাদের তত দেরি হবে। ক্যারেন তখনি রওনা হবার জন্যে তাগিদ দিতে লাগল।

মানরো বিরক্ত হয়ে বললো, দেখ ম্যাডাম এ তোমার ইউস্টন শহর নয়, এ হলো আফ্রিকার জঙ্গল. জঙ্গলের আইন ভিন্ন এবং সে আইন না মানলে বিপদ, জঙ্গলে নালিশ চলে না, আপিল চলে না।

এই সময় সেই পিগমি ক্যারেনকে তাড়াতাড়ি কি কতকগুলো কথা বললো। ক্যারেন বুঝতে পারলো না। মানরোকে জিজ্ঞাসা করলো।

মানরো বললো ও বলছে যে সাদা মানুষের শার্টের পকেটে কতকগুলো দাগ আছে। সেগুলো সে এঁকে দেখাতে পারে।

পিগমি ওদের সম্মতির জন্যে অপেক্ষা না করে একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটতে আরম্ভ করেছে। ওরা তিনজনেই সেদিকে চেয়ে দেখল। পিগমি যে আঁচড় কেটেছে তা হলো আঁকাবাঁকা চারটে অক্ষর কিন্তু পড়া যাচ্ছে, ই আর টি এস অর্থাৎ আর্থ রিসোরসেস টেকনোলজিক্যাল সারভিস।

ক্যারেন এবার চুপ। তার মুখ চোখ বলছে তাহলে তো না গিয়ে উপায় নেই।

পিগমিরা প্রায় ছুটে চলতে লাগলো। ওরা বনপথে এভাবেই যায় কিন্তু পিটারদের অসুবিধে। তবুও তারা যথাসাধ্য অনুসরণ করতে থাকে। প্রায় আধঘণ্টা কখনও দৌড়ে কখনও জোরে হেঁটে ওরা পিগমিদের গ্রামে পৌঁছল।

ওরা গিয়ে দেখল একটা কুটিরের সামনে কাটা একটা গাছের গুঁড়ির ওপর একজন শ্বেতকায় ব্যক্তি জবুথবু হয়ে বসে আছে। পরনে শার্ট প্যান্ট, এক মুখ দাড়ি, চুল এলোমেলো, কপাল ঢাকা, দৃষ্টি উদভ্রান্ত। শার্টের বুক-পকেটে ই আর টি এস ছাপা রয়েছে বড় বড় অক্ষরে।

সেই পিগমি বললো দিন চার আগে ও পাগলের মতো চিৎকার করে ছুটতে ছুটতে ওদের গ্রামে আসে। বুনো জন্তুর মতো ক্ষিপ্ত, সামলানো যায় না। দানোয় পেয়েছে? নাকি ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার? ওরা কিছু টোটকা ওষুধ খাইয়েছিল, কোনো কাজ হয় নি উলটে কথা বন্ধ হয়ে গেছে, কিছু খাচ্ছে না। জেনারেল মুগুরুর সৈন্যরা বোধহয় ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে মারধোর করে ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু ঠিক কি যে হয়েছে তা কেউ বলতে পারছে না।

ওকে দেখেই কিন্তু ক্যারেন চিনতে পেরেছিল, হা ভগবান এ তো আমাদের জিওলজিস্ট বব ড্রিসকল, গত অভিযাত্রী দলের সঙ্গে ছিল, ববি, ববি, আমি ক্যারেন, ক্যারেন রস, আমাকে চিনতে পারছ না?

বব ফিরেও দেখল না, উত্তরও দিল না। মানরো বললো, আমাদের কিছু করবার নেই। ক্যারেন বললো, আমি হিউস্টনে খবর পাঠিয়ে এই গ্রামের ঠিকানা জানিয়ে দিচ্ছি, ওরা কিনহাসা থেকে সাহায্য পাঠিয়ে ওকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাবে। চল আমরা যাই।

পিটার ওর চোখ দুটো দেখবার জন্যে কাছে এগিয়ে যেতেই বব ড্রিসকল মুখে অদ্ভুত আওয়াজ করলো তারপরই চুপচাপ। একজন পিগমি ফিস-ফিস করে মানরোকে বললো, ও বলছে তোমার গায়ে গোরিলার গন্ধ।

ওদিকে কাহেগা তখন তার কুলির দল নিয়ে রাগোরা নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। পিগমিরাই শর্টকাট রাস্তা দিয়ে দু'ঘণ্টার মধ্যে ওদের কাহেগার কাছে পৌঁছে দিল। বিদায় নেবার আগে সতর্ক করে দিল কাছাকাছি কয়েক জায়গায় জেনারেল মুগুরুর ঘাঁটি আছে, ওদের ঘাঁটিও না, এড়িয়ে যাবে।

বড় ঝরনার মতো দূর থেকেই রাগোরা নদীর আওয়াজ শোনা যায়। নদীটি খরস্রোতা, মাঝে মাঝে বড় বড় পাথর আছে। সেই পাথর কাটিয়ে নৌকো বা ভেলায় চেপে স্রোতে ভেসে যেতে হয় । বিপদ পদে পদে। কিছু দূরে একটা গর্জ আছে, নদী সেখানে সরু, তু'দিকে পাথরের উঁচু দেওয়াল। গর্জ পার হলেই নদী অনেক শান্ত এবং প্রশস্ত তবে হিপ্পো-পটেমাস বা জলহস্তীর উৎপাত আছে । পথ খুব বিপদসংকুল । বলতে গেলে প্রাণ হাতে করে যেতে হবে।

তবে মানরো খুব সাহস দিয়েছে । সে বলে সাধারণতঃ কাঠের তৈরি ভেলাতেই সকলে ওই নদীপথে যায় কিন্তু তুর্ঘটনায় কেউ মারা গেছে এমন খবর তার জানা নেই।

এখন তাদের এই পথেই যেতে হবে, অন্য উপায় নেই। ওদের সঙ্গে রবার বোট আছে তিনটে। পাম্প করে ফুলিয়ে রবার বোট রেডি করা হলো।

গোলমাল বাধালো টাই-টাই । গোরিলারা জলকে বড় ভয় পায়। সে কিছুতেই নৌকোয় উঠবে না, বলে সে আর পিটার এখানে থাকবে। যখন সে কিছুতেই রাজি হলো না তখন তাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে নৌকোয় তোলা হলো।

সকলে ভাগাভাগি করে তিনটে নৌকোয় উঠলো। নৌকো ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নৌকো তীব্র গতিতে চলতে লাগলো । ওদের ভয় ছিল পাথরে ধাক্কা লাগলে রবারের ফাঁপা নৌকো ফুটো হয়ে গেলে চুপসে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য নৌকোগুলো স্রোত ধরেই ছুটতে লাগলো, কোনো পাথরেই ধাক্কা লাগলো না। তাদের মনে হচ্ছিল তারা যেন রেস দিচ্ছে।

এই খরস্রোত ও গর্জ পেরিয়ে ওরা প্রশস্ত নদীতে এসে পড়লো। এখানে নদী অনেক শান্ত তবে স্রোতের জোর আছে । নৌকো বেশ জোরেই যাচ্ছে। নদীতে প্রচুর হিপ্পো ভাসছে। কাহেগা মাঝে মাঝে তার নৌকো থেকে চিৎকার করে বলছে 'কিবকো !' অর্থাৎ হিপ্পোর দল আসছে, সাবধান। ওরা চায় না ওদের এলাকায় কেউ আসুক । নৌকোর তলায় গিয়ে ওরা নাকি নৌকো উলটে দেয়। কিন্তু নৌকো এত জোরে যাচ্ছে

যে হিপ্পোরা চেষ্টা করলেও সে সুযোগ পাবে না।

কয়েকটা বাঁক পার হবার পর নদীর স্রোত অনেক কমে গেল। অদূরে মুকেংকো পাহাড় দেখা যাচ্ছে। মাথা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা দেখা যাচ্ছে।

এখন বেলা দশটা। সকলে বেশ উঁচুতে মাউন্ট মুকেংকার ঢালুতে দাঁড়িয়ে আছে। নদীর জলের ঝাপটায় কারও কারও জামাকাপড় সব ভিজে গেছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে সেগুলো শুকোবার চেষ্টা করছে।

ডাঙ্গায় পা দিতে না দিতেই একটা ঘটনা ঘটেছে। সকলে সবে নৌকো থেকে ডাঙ্গায় নেমেছে। টাই-টাই-এর জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে সহসা ইসারা করে পিটারকে বললো, পাখি আসছে।

মানরো জিজ্ঞাসা করলো, কি বলছে তোমার মাংকি?

বললো প্লেন আসছে, ওর কান খুব তীক্ষ্ণ।

পিটারের কথা শেষ হবার কয়েক সেকেণ্ড পরে প্লেনের আওয়াজ পাওয়া গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্লেনও দেখা গেল। প্লেনটার লেজে জাপানী চিহ্ন, মস্ত বড় প্লেন। সকলে অনুমান করলো ওরা ওদের বেসক্যাম্প থেকে ঘাঁটিতে মাল চালান দিচ্ছে।

প্লেন খুব জোরে যাচ্ছে। কিন্তু প্লেনটার দুর্ভাগ্য। সকলে পরপর তিনটে মিসাইল রকেট ফাটার শব্দ শুনলো। শেষেরটা বোধহয় প্লেনটাতে লেগেছে। জেনারেল মুগুরুর কোনো ঘাঁটি থেকে এই মিসাইল ছোঁড়া হয়েছে যেমন ওদের প্লেনেও করা হয়েছিল।

টাই-টাই-এর মেজাজ মোটেই ভালো নেই, একেই তো তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে জল পার করানো হয়েছে তারপর তার দুধ, কলা ও লজেন্স জুটছে না। সে বললো, টাই-টাই বাড়ি যাবে।

কাহেগা তাকে ছোট সাইজের এক ছড়া কলা দিল। সেটা সে লুফে নিয়ে একবার দেখেই ছুঁড়ে ফেলে দিল। সে বার বার বলতে লাগলো, আসল কলা চাই, টাই-টাই বাড়ি যাবে, টাই-টাই গুড গোরিলা, পিটার টাই-টাইকে বাড়ি নিয়ে যাবে। ছোটো ছেলের মতো সে বায়না ধরলো।

মানরো বললো এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি ? চল আমরা যাই, ডক্টর টাই-টাইকে বলো যে আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে পৌঁছে তোমাকে ভালো জিনিস খাওয়াবো, নইলে ওকে এখান থেকে নড়ানো যাবে না। যাই হোক টাই-টাই ওদের কথা শুনে চলতে লাগলো। আকাশে মেঘ করেছে যে কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে।

১৯৩৩-এর আগে কেউ মাউন্ট মুকেংকোর ক্রেটার পর্যন্ত ওঠে নি। ১৯০৮ সালে ফন রাংকে-এর নেতৃত্বে একটা জার্মান দল ঝড়ের মুখে পড়ে ফিরে গিয়েছিল, বেশি দূর উঠতে পারে নি। ১৯১৩ সালে একটা বেলজিয়ান পার্টি দশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠে আরও ওপরে ওঠবার আর পথ খুঁজে পায় নি। ১৯১৯ সালে আর একটা জার্মান পার্টিকে মাঝপথে অভিযান পরিত্যাগ করতে হয় কারণ দলের দু'জন মারা গেল। ওরা বারো হাজার ফুট অতিক্রম করেছিল। মুকেংকো পাহাড়ে ওঠা কিন্তু দুরূহ নয়।

ন' হাজার ফুটের ওপরে জঙ্গল নেই, ঘাস। বাতাস পাতলা। ওঠবার সময় হাঁফ ধরে, ঘন ঘন বিশ্রাম নিতে হয়। ক্যারেনের বেশি কষ্ট হচ্ছিল। দশ হাজার ফুটের পর ঘাসও নেই, শ্যাওলা। মাঝে মাঝে মোটা পাতা-ওয়ালা লোবেলিয়া জাতীয় গাছ দেখা যায়।

সকলে বেশ ক্লান্ত কিন্তু মানরো তাগাদা দেয়। সে তাড়াতাড়ি একটা আশ্রয় চায়। মেঘের যা ঘনঘটা অবস্থা এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ঝড়ে জলে নাস্তানাবুদ হতে হবে। শিলাবৃষ্টিও হতে পারে। এখানে এক একটা শিলার সাইজ টেনিস বলের মতো।

ওদের ভাগ্য ভালো। এগারো হাজার ফুট ওপরে ওঠার পর মেঘ কেটে গেল, রোদ দেখা দিলো। এখানে ওরা থামলো। লেসার যন্ত্র না কি বসাবে। দুটো লেসার বসানো হলো। এই দুই লেসারের অদৃশ্য সন্ধানী রশ্মি অরণ্যের মাথা দিয়ে অনেক দূর যাবে। ক্যারেন মনে করে এক জায়গায় রশ্মি দুটো কাটাকাটি করবে। যেখানে কাটাকাটি করবে ঠিক তার নিচেই জিঞ্জ শহর পাওয়া যাবে।

নাকে গন্ধকের গন্ধ আসছে। যন্ত্রপাতি খাটিয়ে ওরা আরও ওপরে উঠলো।

এখন বিকেল পাঁচটা। অদূরে মাউন্ট মুকেংকোব ক্রেটার, গন্ধকের গন্ধ বেশ তীব্র। আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে ধোঁয়া ও লাভা বেরোচ্ছে। লাভা একটা হ্রদে জমা হচ্ছে। ক্রমশঃ সন্ধ্যা হলো। আকাশ অন্ধকার। ওরা এখন লেসার রশ্মি দেখতে পাচ্ছে।

অরণ্যের মাথায় যেখানে লেসার রশ্মি কাটাকাটি করেছে এবং যেখানে ক্যারেন অনুমান করছে জিঞ্জ শহর পাওয়া যাবে সেখানে ওরা আগামী কালই পৌঁছে যাবে, ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয়।

যথারীতি রাত্রে হিউস্টনে রিপোর্ট পাঠাবার জন্যে ক্যারেন হিউস্টনের সঙ্গে যোগাযোগ করলো। ক্যারেন অবাক, ট্রানসমিশন কেউ জ্যাম করছে না। কনসরটিয়মের কি হলো? ওদের যন্ত্র কি খারাপ হয়ে গেল?

ক্যারেন মানরোকে বললো, তা নয়, আমার মনে হচ্ছে ওরা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেছে এবং সম্ভবতঃ ডায়মণ্ড হাতিয়ে এখন ফেরার পথে।

হিউস্টনের সঙ্গে সংযোগ হলে তাদের হাকামিচির দল সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তারাও উত্তর দিলো, আমাদেরও বিশ্বাস কনসরটিয়ম জিঞ্জ সাইটে পৌঁছে গেছে। তোমাদের এখন ফেরা উচিত।

ফেরা উচিত? কখনোই নয় ক্যারেন বললো, এসেছি যখন তখন শেষ পর্যন্ত না দেখে আর ফিরবো না। আর তো মাত্র একদিনের জার্নি।

পরদিন ওরা নামতে আরম্ভ করলো। এবার লক্ষ্য জিঞ্জ। আবার গভীর রেনফরেস্টে ঢুকতে হবে। ওরা লেসার বিম অনুসরণ করে চলেছে। দিনের বেলায় লেসার বিম দেখা যাচ্ছে না কিন্তু ক্যারেনের সঙ্গে ক্যাড-মিয়াম ফটো সেল ফিট করা একটা ট্র্যাক গাইড আছে। কম্পাসের মতো সেই ট্র্যাক গাইড ওদের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে।

ঘণ্টা দুই চলার পর ওরা আবার রেনফরেস্টে প্রবেশ করলো। মানরো বললো এবার মাউণ্টেন গোরিলার দেখা পাওয়া যেতে পারে। পনেরো মিনিটও কাটলো না। কানে তালা ধরা একটা আওয়াজ শোনা গেল। মানরো বললো, গোরিলার চিৎকার।

টাই-টাই তার সাংকেতিক ভাষায় জানালো, গোরিলা বলছে চলে যাও।

পিটার বললো, কিন্তু টাই-টাই আমাদের তো যেতেই হবে।
গোরিলা চায় না মানুষ লোক আসে, টাই-টাই বললো।
মানুষ লোক গোরিলাদের কোনো ক্ষতি করবে না টাই-টাই।
টাই-টাই বললো, গোরিলা মানুষ লোকের ক্ষতি করতে পারে।
টাই-টাই কিন্তু জঙ্গলের গোরিলাদের ইঙ্গিত বুঝতে পারে নি। গোরিলা-রাই ভয় পেয়েছিল, মানুষ তাদের ক্ষতি করবে।
ওরা আর সেখানে দাঁড়ালো না, এগিয়ে চললো। পিটার আগে যাচ্ছে কারণ মানরো একজন কুলিকে সাহায্য করবার জন্যে পেছিয়ে পড়েছে। ওরা একটা পরিষ্কার জায়গায় এসে পড়েছে এবং এইখানে গোরিলার দেখা পাওয়া গেল। আগে গোরিলার চিৎকার শুনলেও গোরিলা দেখতে পায় নি, ঘন গাছের আড়ালে কোথাও জন্তুগুলি লুকিয়েছিল।
ওরা দেখতে পেল সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বড়সড় একটা পুরুষ গোরিলা গ্রে রং পিঠটা কিন্তু সাদা। পিছনে কয়েকটা স্ত্রী গোরিলা রয়েছে। সবাই ওদের দিকে চেয়ে রয়েছে, যেন বলতে চাইছে মানুষদের আমরা এখানে চাই না, এটা আমাদের রাজত্ব।
সামনের পুরুষ গোরিলাটা বেশ বড়, লম্বায় ছ'ফুট হবে, ওজন কোন্ না চারশ পাউণ্ড হবে। পিটার জঙ্গলে এই প্রথম গোরিলা দেখলো। চিড়িয়া-খানায়, সিনেমায় বা ছবিতে সে যত গোরিলা দেখেছে তাদের থেকে এই গোরিলার চেহারা বেশ কিছু স্বতন্ত্র। দেখে মনে হয় যেন লম্বা লোমওয়ালা মানুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোমগুলোও কালো নয়, ধূসর। গোরিলটা মুখে হো হো আওয়াজ করতে করতে ঘাস ছিঁড়তে লাগলো।
ক্যারেন এসে পিটারের পেছনে দাঁড়িয়েছে। গোরিলার এমন মুখোমুখি এসে সে ভয় পেয়েছে। পিটার কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার বই-পড়া বিদ্যে বলে গোরিলাদের প্রকৃতি শান্ত, তারা কাউকে আক্রমণ করে না। গোরিলাটা ছেঁড়া ঘাসগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাতের তালু দিয়ে বুকে কাঁপা আওয়াজ করতে লাগলো। কি বলতে চাইছে? তোমরা চলে না গেলে এইরকম ভাবে ঘাসের মতো তোমাদের ছুঁড়ে দূরে ফেলে দেবে?

পিটারদের ভয় দেখাবার জন্যে গোরিলাটা দাপাদাপি আরম্ভ করলো। পিছনের মাদী গোরিলাগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। গোরিলাটা বোধহয় ভেবেছিলো মানুষরা ভয় পেয়ে এবার চলে যাবে কিন্তু যখন দেখলো মানুষগুলো দাঁড়িয়েই রয়েছে তখন সে বিরাট চিৎকার করে হাতে-পায়ে ছুটে পিটারের দিকে তেড়ে এলো।

পিটার ভেবেছিলো সে ছুটে পালিয়ে যায় কিন্তু পালালো না, মাটির দিকে চোখ নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবতে লাগলো তার বই-পড়া বিদ্যে কি ভুল ? গোরিলারা তো আক্রমণ করে না। মনে মনে সে কল্পনা করছে মস্ত মাথাওয়ালা লোমশ পশুটা এই বুঝি তার ওপর এসে পড়ল। গোরিলাটা খুব কাছে এসে পড়েছে। পিটার তার ছায়া দেখতে পাচ্ছে, গায়ের গন্ধও পাচ্ছে কিন্তু সহসা সব শান্ত হয়ে গেল। সাহস করে মুখ তুলে পিটার দেখলো গোরিলাটা ফিরে যাচ্ছে। যেখান থেকে গোরিলাটা এসেছিলো সেখানে ফিরে যেয়ে বোকার মতো মাথা চুলকোতে লাগলো। মানুষগুলো ভয় পেলো না ? গোরিলাটা হাত দিয়ে কয়েকবার মাটি চাপড়ে সেখান থেকে চলে গেল। মাদী গোরিলাগুলো তাকে অনুসরণ করলো।

মানরো এবার এগিয়ে এসে পিটারকে বললো, তোমার কথাই ঠিক দেখছি। ভয় পেয়ে না পালালে গোরিলা মানুষকে আক্রমণ করে না। ক্যারেন কিন্তু তখন চোখ মুছছে, সে ভয়ে কেঁদে ফেলেছিলো এবং তখন পিটারের পা কাঁপতে লাগলো। বোধহয় অনুভব করলো কি সাংঘাতিক বিপদেই না সে পড়েছিলো।

মানরো বললো, আপাতত বিপদ কেটে গেছে এবং বোঝা গেলো এদিকে গোরিলা থাকলেও তারা আমাদের আক্রমণ করবে না অন্ততঃ দিনের বেলায় তো নয়ই অতএব চল এগিয়ে যাওয়া যাক।

ওরা আবার চলতে লাগলো। ঘণ্টাখানেক চলার পর দেখলো সামনে একটা প্লেন মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। প্লেনখানা ওরা চিনতে পারলো। জাপানী চিহ্নওয়ালা সেই প্লেনখানা যেটাকে লক্ষ্য করে মুগুরুর গোলন্দা-

জরা রকেট ছুঁড়েছিলো। শেষ রকেটটা বোধহয় চরম আঘাত হেনেছিল আশেপাসে কয়েকটা গাছ বা ডালপালা ভেঙে পড়েছে। কাহেগা একটা ভাঙা গাছে উঠে প্লেনের ভেতরটা দেখে বললো ভেতরে অনেক বাক্স মাল রয়েছে কিন্তু কোনো মানুষ নেই। প্লেনখানা তাহলে হাকামিচিদের জন্যে মালপত্তর নিয়ে যাচ্ছিলো। ক্যারেন মনে মনে খুশি হলো, হাকামিচিরা তাহলে তাদের সরবরাহ পায় নি।

মানরো বললো, তাতো পায় নি কিন্তু ওরা প্লেনটার খোঁজে এলো না কেন ? তাদের কি হলো ? যাক এসব আমাদের জন্যেই রইলো, দরকার হলে আমরাই মালপত্তরগুলো বার করে নিয়ে যাবো।

আবার একসময়ে যাত্রা শুরু হয়েছে, আবার তারা চলেছে, এবার স্থির লক্ষ্য সেই রহস্যময় জিঞ্জ শহর। সত্যিই কি সেই শহরের কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে ? কি তারা দেখবে সেখানে ? যেজন্যে সেখানে যাওয়া তা কি তারা সেখানে পাবে ?

ওরা এখন বনের ভেতর দিয়ে চলেছে। জমিতে কত পাতা জমেছে, কত-সরু সরু কাঠি জমেছে বছরের পব বছর। ওরা তার ওপর দিয়েই চলেছে। বিচিত্র আওয়াজ হচ্ছে।

আওয়াজের সুর হঠাৎ বদলে গেল, অন্যরকম আওয়াজ হচ্ছে। গাছেব ডাল মাড়ানোর এ আওয়াজ নয়, তবুও শক্ত কিছু মাড়াচ্ছে মনে হলো। ওরা দাঁড়িয়ে পড়লো। নিচের জমি থেকে পাতা ও কিছু আবর্জনা সরা-তেই বেরিয়ে পড়লো অনেক হাড়। যেন হাড়ের রাজ্য। কোনো সময়ে এখানে মৃত পশু বা মানুষ বোধহয় এখানে জমা করে হতো বা হয়ে-ছিছল। তাদেরই কংকাল হাড়গোড় এখনও পড়ে রয়েছে।

মানরো বললো, এই তো কানিয়ামাগুফা, প্লেস অফ বোনস্। মানরো কুলিদের দিকে চাইলো তাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার জন্যে। না তারা ভয় পায় নি তবে যেন ধাঁধাঁয় পড়েছে। হাড় সম্বন্ধে ওদের কুসংস্কার নেই, থাকলে এতক্ষণ গোলমাল আরম্ভ করতো।

পিটারকে টাই-টাই বললো, পায়ে লাগে খারাপ জায়গা।
হাড় সম্বন্ধে এদের মধ্যে একমাত্র বিশেষজ্ঞ পিটার ইলিয়ট। সব জন্তুর না হলেও বানর জাতীয় ও মানুষের হাড় সে উত্তমরূপে চেনে। পিটার হাড় পরীক্ষা করতে লেগে গেল। বেশির ভাগ হাড়ই বানর, শিম্পাঞ্জি ও ছোট পশুর। দু'চারটে গোরিলার হাড়ও রয়েছে কিন্তু মানুষের হাড় নেই। কিন্তু এদিকে শিম্পাঞ্জি পাওয়া যায় না। শিম্পাঞ্জিরও কয়েকটা খুলি পাওয়া গেল। খুলিগুলো সব ভাঙা।
ক্যারেন জিজ্ঞাসা করলো, হাড়গুলো কত পুরনো বলে তুমি অনুমান কর পিটার?
আমার তো মনে হচ্ছে অন্ততঃ একশ বছর পুরনো হবে।
মানরো বললো, এত পুরনো? তাহলে তখন কি এখানে শিম্পাঞ্জি ছিল?
না মানরো; এই বনে শিম্পাঞ্জি কখনই বাস করতো না। এখানে বাস করে কলোবাস মংকি। পিটার বললো।
তাহলে এখানে চিম্পের হাড় এলো কি করে আর প্রত্যেকটার খুলি ভাঙা কেনো? এ আর এক রহস্য।
ক্যারেন খালি চুপ করে রইলো। সে তার যন্ত্রপাতি চেক করতে ব্যস্ত। টাই-টাই হাতে পায়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিলো। সাংকেতিক ভাষায় পিটার তাকে জিজ্ঞাসা করলো, এই জায়গাটা কি?
টাই-টাই উত্তর দিলো, খারাপ জায়গা, বাতাস খারাপ, মানুষ মরে।
মানরো প্রশ্ন করলো, ও কি বললো?
এখানকার বাতাস দূষিত। মানুষ মরে। পিটার উত্তর দিলো।
ওরা আর অপেক্ষা করলো না। কুলিরা আবার মাথায় মোট তুলে নিলো। আবার যাত্রা শুরু হলো। চলছে, ওরা চলছে। দৃশ্য একঘেয়ে লাগছে। নানারকম গন্ধ নাকে লাগছে, তাও অভ্যাস হয়ে আসছে সহসা বিশ্রী পচা একটা গন্ধ ওদের নাকে আঘাত করলো।
মানরো বললো, এ তো মানুষ পচা গন্ধ। সবাই সাবধান। সে আর কাহেগা হাতে লাইট মেসিন গান তুলে নিলো। সেফটি ক্যাচ খুলে দুজনে

প্রস্তুত হয়ে চারদিক নজর করতে করতে এগিয়ে চললো।

কয়েক গজ যেতেই হাকামিচির কনসরটিয়ম দলের ছিন্নভিন্ন তাঁবুগুলো ওদের চোখে পড়লো। একজনও বেঁচে নেই। লাশগুলিকে মাছির ঝাঁক ছেকে ধরেছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য এবং তীব্র পচা গন্ধ। পিটার আর ক্যারেন নাকে রুমাল চাপা দিলো।

মানরো বললো, আমি লড়াই ফেরত লোক, আমার এসব দেখা অভ্যাস আছে। দেখি কি ঘটেছে ?

সবকটা তাঁবু ছিন্নভিন্ন তাঁবুর চারদিকে আত্মরক্ষার জন্য যে ইলেকট্রিক তার বা পেরিমিটার ডিফেন্স লাগানো হয়েছিলো সেসবও তাঁবুর সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে।

একটা লাস উপুড় হয়ে পড়েছিল। মাছি তাকে ঢেকে রেখেছে, মুখ না দেখলে তাকে চেনা যাবে না। মানরো পা দিয়ে তাকে চিৎ করে দিলো। মাছিগুলো ভন্‌ভন্‌ করে উড়ে গেল।

ক্যারেন নাকে রুমাল দিয়ে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে বললো, এ তো বিখটার। মানরো হাঁটু গেড়ে বসে দেখলো তার খুলিকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। মাথার দুই দিক থেকে প্রচণ্ড জোরে একই সঙ্গে কেউ আঘাত করেছো। মানরো দেখলো সবকটা মানুষকেই এইভাবে হত্যা করা হয়েছে।

তাঁবুগুলো তো ছিন্নভিন্ন হয়েছেই সেই সঙ্গে সব সাজসরঞ্জাম যন্ত্রপাতি সব কিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

মানরো বললো, এখন জানা গেল ক্যারেন তোমার ট্রান্সমিটারে কেন জ্যামিং হচ্ছিল না এবং প্লেনখানা ধ্বংস হলেও এরা খোঁজ নিতে কেন যেতে পারে নি।

টাই-টাই এই স্থান ত্যাগ করবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে তার নির্বাক ভাষায় পিটারকে বার বার জানাচ্ছে, খারাপ জিনিস আসছে, খারাপ জিনিস।

মানরো শুনে জিজ্ঞাসা করলো, জিনিস বলতে ও কি বোঝাচ্ছে ?

পিটার বললো আমরা অনেক সময় ভূতপ্রেত বা কোনো বিভীষিকার নাম উল্লেখ না করে বলি অমুক জিনিসটা। টাই-টাই কল্পনা করছে এখানে কোনো বিভীষিকা দেখা দিতে পারে।

কাহেগাকে ক্যারেন অনুরোধ করলো ওদের মালপত্তরগুলো খুঁজে দেখতে, কোথাও টাইপ-টু-বি ব্লু ডাইমণ্ড পাওয়া যায় কি না। কাহেগার সঙ্গে মানরোও যোগ দিলো। না কোথাও ব্লু ডায়মণ্ড পাওয়া গেল না।

ক্যারেন রস নিশ্চিন্ত হলো। তাহলে ওরা জিঞ্জ শহর পর্যন্ত যেতে পারে নি।

জিনিসপত্তর খোঁজবার সময় বিশ লিটারের এক ক্যান উত্তম কেরোসিন তেল পাওয়া গিয়েছিল। মানরো সেই কেরোসিন ধ্বংসস্তুপের ওপর ছিটিয়ে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিলো। তারপর আঙুল দিয়ে বুকে ক্রশ চিহ্ন এঁকে বললো; লেট'স গো।

আবার সেই একঘেয়ে যাত্রা শুরু হলো। পথ চলতে চলতে পিটার জিজ্ঞাসা করলো; আচ্ছা ক্যারেন ওদের তো সব যন্ত্রপাতি ভেঙেচুরে তচনচ করে দিয়েছে তবুও ওরই মধ্যে তোমার চোখে এমন কিছু যন্ত্র চোখে পড়ল কি যা আমাদের নেই?

হ্যাঁ, আমার নজরে পড়েছে। ওরা একটা অ্যানিম্যাল পেরিমিটার ডিফেন্স তৈরি করেছিল। ক্যাম্পের চারদিকে সরু তারের জাল জমি থেকে তিন চার ফুট উঁচুতে ওরা খাটিয়ে দিয়েছিল। সেই তার দিয়ে ওরা ওদের কাম্পগুলোর চারদিকে বেড়া দিয়েছিল। কোনো বড় জন্তু বা মানুষ তাদের কাছে এলেই একটা সরু তীব্র ও তীক্ষ্ণ শব্দ কানের পর্দায় প্রচণ্ড আঘাত করবে। এতো জোর ও কর্কশ সেই আওয়াজ যে সহ্য করাই কঠিন।

আমাদের সে যন্ত্র নেই?

নেই বললে বলা ভুল হবে, আছে, তারের জালও আছে, শুধু একটা বক্সের সঙ্গে সেই তারের জাল ফিট করে কয়েকটা অ্যামপ্লিফায়ার বসাতে হবে আর কি।

তাহলে এবার আমরা যেখানে ক্যাম্প ফেলব সেখানে ওরকম লাগিয়ে নিলে হয় না?

আমরা তো ক্যাম্পের চারদিকে হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিক তার লাগাবো, দুটো একসঙ্গে লাগালে অসুবিধে আছে তাছাড়া ঐ আওয়াজ আমরা নিজেরাই হয়তো সহ্য করতে পারবো না।

আরিটেসা-এর প্রথম অভিযাত্রী দলের ক্যাম্প যেখানে ধ্বংস হয়েছিলো ওরা সেখানে বিকেলে পৌঁছলো। ইতিমধ্যে গাছ ও লতাপাতা জন্মে ধ্বংসস্তুপ প্রায়আবৃত করে দিয়েছে। এখানে গাছপালা খুব তাড়াতাড়ি গজিয়ে দ্রুত বড় হয়।

সবকিছু ভেঙে তচনচ করে দিয়েছে। ভিডিও ক্যামেরাটা ভাঙা অবস্থায় একদিকে পড়ে রয়েছে। সবুজ সার্কিট বোর্ডটা দূরে ছিটকে পড়েছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। ওরা আর অপেক্ষা করলা না। আশ্চর্য! একটাও ডেড-বাড পড়ে ছিল না। ক্যারেন ক্রুগারের ডায়েরিখানা খোঁজ করেছিল কিন্তু সেটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শুধু মলাটের কিছু অংশ পড়েছিল। টাই-টাই চঞ্চল ওঠে উঠলো। সে হাতে পায়ে লাফালাফি করতে লাগলো। পিটার তাকে অনেক কষ্টে শান্ত করে নির্বাক ভাষায় প্রশ্ন করলো, এমন করছ কেন?

না যাব খারাপ জায়গা পুরনো জায়গা না যাব ভালো নয়।

তা হয় না টাই-টাই আমাদের যেতেই হবে।

আরও পনেরো মিনিট পরে একটা বাঁক ঘুরতেই গাছের ফাঁকে দিয়ে মাউন্টি মুকেংকো দেখা গেল। তখন অন্ধকার নেমে আসছে। গাছের মাথার ওপর সন্ধানী লেসার বিমও ওদের নজরে এলো।

ফিকে সবুজ দুটো অনুজ্জ্বল সন্ধানী লেসার বিম যেখানে কাটাকাটি করেছে ঠিক তার নিচে গাছপালা ও শ্যাওলায় ঢাকা অনেকগুলো পাথরের কাঠামো ওদের নজরে পড়লো। এই তাহলে কি সেই প্রাচীন ও হারানো শহর জিঞ্জ?

পিটার পাশ ফিরে চেয়ে দেখলো টাই-টাই নেই। কোথায় গেল? না, সে কাছাকাছি কোথাও নেই। দল ছেড়ে সে বোধহয় জঙ্গলে চলে গেছে। পিটার প্রথমে ভেবেছিল বোধহয় মজা করবার জন্যেই টাই-টাই কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে, একটু পরেই ফিরে আসবে। কিন্তু না, সে ফিরে এলো না।

পিটার ভাবে সে পালায় নি। জঙ্গলের গোরিলারা তাকে ধরে নিয়ে যেয়ে আটকে রেখেছে। সে ফিরে আসবেই। শিশুকাল থেকে মানুষের সঙ্গে লালিত, জঙ্গল সে চেনে না, জঙ্গলের পশুদের ভাষা সে জানে না, কি করে জঙ্গলে যাবে? জঙ্গলে এসেও সে কয়েকবার বাড়ি অর্থাৎ অ্যামেরিকায় ফিরে যেতে চেয়েছে। সে ঠিক ফিরে আসবে।

ক্যাবেন বললো, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে। চল যাওয়া যাক এবার কোথাও তাঁবু ফেলা যাক। ইচ্ছে হলে টাই-টাই ফিরে আসবে। সে নিজের ইচ্ছেয় চলে গেছে। আমরা তাকে তাড়িয়ে দিই নি।

ওরা সুবিধামতো একটা জায়গা দেখে তাঁবু ফেললো। তাঁবুর চারপাশে আত্মরক্ষামূলক হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিক তারের জাল খাটানো হলো, অন্য কয়েকটা যন্ত্রপাতিও বসানো হলো।

সেদিন ডিনার বিশেষ জমলো না। টাই-টাই চলে যাওয়ায় পিটারের মেজাজ ভালো ছিল না, পথে আসতে আসতে হাকামিচিদের ক্যাম্পের যে দুর্দশা ওরা দেখেছিল তাতে অন্যান্যদের মন ভারাক্রান্ত। প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও তারাও তো অভিযাত্রীদল, তারাও তো মানুষ! সঙ্গে এক বোতল উৎকৃষ্ট শ্যামপেন ছিল মানরোর ইচ্ছে ছিল সেই বোতলটা ওরা আজ রাত্রে শেষ করবে, জিঞ্জ শহর পৌছনো উপলক্ষে সেলিব্রেট করবে আর কি! কিন্তু মানরো সেকথা ভুলেই গেলো।

খেতে বসে মানরো প্রস্তাব করলো কাল সকালে তোমরা যখন জিঞ্জ শহরে প্রবেশ করবে আমি যদি সেই সময়ে দু' একজন কুলি নিয়ে হাকামিচিদের ভেঙে যাওয়া প্লেনটায় একবার যদি যাই তো কেমন হয়? অনেক দরকারী মালপত্তর বা ভালো কিছু খাবার পাওয়া যেতে পারে। আমরা যদি না

যাই তো কিগানিরা ওগুলো লুটপাট করে নেবে।
ক্যারেন রাজি হলো না। সে বললো, এ কথা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে পরে আমরা বেইজ্জত হয়ে যাবো তাছাড়া আমরা তোমাকে এখন ছাড়তেই পারবো না। তারপর ধর তুমি যদি কিগানিদের খপ্পরে পড়ো? তাহলে? থাক মানরো, ও নিয়ে এখন মাথা ঘামিও না।
ক্যাম্পের বাইরে রাত্রে পাহারা দেবার ব্যবস্থা হলো। এক এক দল চার ঘণ্টা করে পাহারা দেবে। প্রথম দলে থাকবে মানরো, পিটার এবং কাহেগা। ওরা চোখে নাইট গগল্ এবং হাতে লাইট মেসিন গান নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো। এই নাইট গগল্স পরলে রাত্রে অন্ধকারেও দেখা যায়, কিন্তু ওদের দেখাচ্ছিল ঠিক গঙ্গা ফড়িং-এর মতো। চশমাগুলো একটু ভারি, তাহোক কিন্তু অপরিহার্য।
পিটার চশমা খুলে একবার বাইরে চাইলো। ঘোর অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। কোনো শব্দও শোনা যাচ্ছে না, গাছের পাতাও নড়ছে না। কোথায় অ্যামেরিকা আর কোথায় এই ভিরুঙ্গার রেনফরেস্ট!

পাঁচশো বছর আগে কিংবা যে যুগে জিঞ্জ নির্মিত হয়েছিল সেই সময়ের মান অনুসারে এটাকে শহর বলা চলতো কিন্তু এখন তা আর বলা যায় না, শহরটা অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকলেও কটাই বা বাড়ি ছিলো? বড় জোর দু'শো। অধিকাংশই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে বা অরণ্য গ্রাস করেছে। এখন যে বাড়ি বা ঘর দাঁড়িয়ে আছে সেগুলোই দেখতে হবে। দেখতে হবে কোথাও ব্লু-ডায়মণ্ড সঞ্চিত আছে কি না বা কোথাও খনি আছে কি না। একদা যেখানে আগ্নেয়গিরি ছিল বা এখনও আছে তারই কাছে হীরে পাওয়া যেতে পারে। অনেক নিচে পৃথিবীর গহ্বরে প্রবল তাপ ও চাপে কয়লা হীরে হয়ে যায়। আগ্নেয়গিরি থেকে যখন অগ্ন্যুৎপাৎ হয় তখন সেই হীরে অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে হীরেও বেরিয়ে আসে। কিছু হীরে মাটি চাপা পড়ে যায়, আবার কিছু হীরে হয়তো কোনো ভাবে

নদীতে গিয়ে পড়ে, স্রোতে ভাসতে ভাসতে দূরে চলে যায়। তাই আফ্রিকার কয়েকটা নদীতে হীরে পাওয়া গেছে।

২১ জুন তারিখে সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ওরা সেই হারানো শহরে প্রবেশ করলো। হারানো শহর আর হারিয়ে রইলো না। এবার আর অনুমান বা গালগল্প নয়, মানুষ তাকে সত্যিই খুঁজে বার করলো।

শহরে প্রবেশ করে ওরা একটা টেলিভিসন বসালো। চাঁদ থেকে যেভাবে চাঁদে অবতরণের ছবি পৃথিবীবাসীবা দেখেছিল অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে চাঁদ থেকে পৃথিবীতে ছবি আনা হচ্ছিল সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে জিঞ্জ থেকে ইউস্টনে ছবি পাঠানো হবে। সেখানে তো ট্রেভিস সর্বদা প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। ছবি পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে এখানে ভিডিওতে ছবি উঠে যাবে। সেই ভিডিও টেপ ওরা সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরবে।

মানরো ওদের সাবধান করে দিলো সাপ আছে, সাবধানে পা ফেলবে। সত্যিই ছোট বড় সাপ ও বেশ বড় বড় কিছু মাকড়সা আছে। মাকড়সাগুলো দেখলে ভয় লাগে।

শহরের একটা প্ল্যান তৈবি করতে পারলে ভালো হতো। ওদের অনুমান জিঞ্জ ছিল একটা মাইনিং টাউন। শহরেব বাড়িব অবস্থান দেখে খনির অবস্থান জানা যেতে পারে। প্রায় তিন বর্গ কিলোমিটার জুড়ে শহর, বেশির ভাগ জায়গা অগম্য এবং গিয়েও কোনো লাভ নেই।

প্ল্যান তৈরি করবার জন্যে ওরা সঙ্গে কয়েকটা বেতার যন্ত্র এনেছিল। সেই যন্ত্রেব সাহায্যে শহবের একটা অংশেব মাত্র মোটামুটি নকশা দাঁড় করানো গেলো। এই দিয়েই আপাততঃ কাজ চালানো যাবে।

পিটার প্রথমেই লক্ষ্য করলো ভাঙা বাড়ির দরজা জানালাগুলো। টাই-টাই যেমন ছবি এঁকেছিল, সেই অর্ধ-বৃত্তাকার দরজা জানালা, এগুলোও ঠিক সেই রকম। ক্যারেনও দরজা জানালাগুলো লক্ষ্য করছিল, সেও তো পড়েছে কোনো এক ভ্রমণকারী দরজা জানালার এই রকমই বর্ণনা দিয়েছে। বাড়িগুলো পাথরের তৈরি। ঘরগুলো চারকোণা, লম্বা ধরনের এবং সব ঘর প্রায় একই মাপের। কোনো বৈচিত্র্য নেই। সে যুগের সভ্যতার

কোনো নিদর্শনও কোথাও নেই।

পিটার ছটো মোটা ও শক্ত পাথর কুড়িয়ে পেলো। মাটিতে পড়ে থাকা এমনি সাধারণ পাথর নয়, বড় পাথর কেটে একজোড়া পাথর তৈরি করা হয়েছে। ওরা বোধ হয় এই ছ'খণ্ড পাথরের মধ্যে চাপ দিয়ে মশলা বা শস্য পেশাই করতো। বেশ মজবুত করেই বাড়িগুলো তৈরি করা হয়েছিলো। ওরা নানারকমের ঘর দেখতে পেল। একটা ঘরের দেওয়ালে কয়েকটা খুপরি যেন সিনেমা হলের টিকিট ঘর। কয়েকটা ছোট ঘর দেখা গেল বেশ ছোট, মানুষ সে ঘরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। ঘরের সামনে গরাদ। মানরো বললো এটা জেলখানা, পিটার বললো, চিড়িয়াখানাও। ক্যারেন বললো আফ্রিকার গভীর অরণ্যে যেখানে পশুরা এমনিই ঘুরে হতে পারে বেড়াচ্ছে, সকলে তাদের দেখতেই পাচ্ছে, সেখানে চিড়িয়া-খানার দরকার কি ? মানরো ঠিকই বলেছে, এটা জেলখানা।

ঘুলঘুলি আছে বলে ওরা আগের বাড়িটার নাম দিলো 'পোস্ট-অফিস,' আর দ্বিতীয় বাড়ির নাম দিলো 'জেলখানা'। জেলখানার সামনে বড় একটা উঠোন। আজকালকার হরাইজানটাল বার প্যারালাল বারের মতো পাথরের তৈরি কয়েকটা বার এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এখানে বোধহয় জিমন্যাস্টিকের ট্রেনিং দেওয়া হতো। ওরা তাই উঠোনটার নাম দিলো 'জিমন্যাসিয়াম'। মানরোই বললো, এখানে সৈনিকদের ট্রেনিং দেওয়া হতো।

সেই শহরের মানুষরা কেমন ছিল, তাদের জীবনযাত্রাই বা কেমন ছিল তার কোনো আভাস ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো ঘরে দেওয়ালে বেশ পুরু হয়ে কালচে সবুজ রঙের শ্যাওলা জমেছে কিন্তু একটা বড় অদ্ভুত ব্যাপার যে মেঝে থেকে ওপরের দিকে শ্যাওলা উঠে দেওয়ালের মাঝা-মাঝি অংশে একটা টানা সরল রেখায় শেষ হয়েছে।

কেউ যেন দেওয়ালে একটা লাইন টেনে বলে দিয়েছে, শ্যাওলা তোমরা এই লাইনের ওপরে আর উঠবে না। বড়ই আশ্চর্য তো! সবাই অবাক হয়ে সেইদিকে চেয়ে রইল।

ভারি অদ্ভুত তো, বলে মানরো তার আঙুল দিয়ে খানিকটা শ্যাওলা তুলে দিতেই রহস্য জানা গেল। দেখা গেল ফিকে নীল রঙের ওপর কি সব আঁকা রয়েছে কিন্তু কি আঁকা রয়েছে তা তারা ভালো করে বুঝতে পারলো না। আরও ভালো করে পরিষ্কার করে দেখতে হবে। পরে ওরা দেখেছিলো অনেক ঘরের দেওয়ালেই এই রকম ছবি আঁকা রয়েছে। ছবিগুলো আঁকা হয়েছে পাথরের দেওয়ালে খোদাই করে। এখনও ছবিগুলো বেশ স্পষ্ট আছে। লাঞ্চ সেরে ওরা ফিরে এসে কয়েকটা ঘরের দেওয়ালের শ্যাওলা সাফ করতে লাগলো। তার আগে ঘরে ঢোকার রাস্তাও পরিষ্কার করতে হলো। মানরো হাসতে হাসতে ক্যারেনকে বললো, তোমরা তো সব এনেছ. একজন আর্ট হিস্টোরিয়ান যদি আনতে তাহলে কি ভালই না হতো বলো তো!

ক্যারেন বললো, আমরা তো ছবি তুলে নিয়ে যাবো। অ্যামেরিকায় ফিরে ছবিগুলো আমরা স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটে পাঠিয়ে দোব, তারাই ছবির সঠিক বিশ্লেষণ করবে।

দেওয়ালের ছবি দেখে এটুকু বোঝা গেল যে জিঞ্জ শহরে যারা বাস করতো তারা ছিল বেশ কালো ও লম্বা, মাথা গোল, পেশীবহুল। বাণ্টুভাষী মানুষদের সঙ্গে তাদের মিল আছে। দু'হাজার বছর আগে বাণ্টুরা আফ্রিকার সাভানা অঞ্চল থেকে কঙ্গোয় প্রবেশ করেছিল।

ছবিগুলো দেখে অনুমান করা যাচ্ছে যে তারা খুব পরিশ্রমী ছিল। তারা নকশা আঁকা ভালো পোশাক পরতো। একটা ছবিতে হাটের দৃশ্য দেখা গেল। দোকানীরা ছোট ছোট ঝুড়ি করে কি বিক্রি করছে, জিনিসগুলি গোলাকার, ক্রেতারা দর করছে। ঝুড়িগুলি ভারি সুন্দর দেখতে। ঝুড়ি না বলে টুকরি বলাই উচিত। টুকরিগুলোর গায়ে নকশা আঁকা। ওরা মনে করেছিল গোলাকার বস্তুগুলো বুঝি ফল। কিন্তু এখানে ওরা কোনো ফলের গাছ দেখতে পায় নি তাই ক্যারেন বললো, ওগুলো ফল নয়, বড় সাইজের হীরে, এক একটা হীরে ছেলেদের খেলার মারবেলের মতো বড় হবে। ওরা টুকরি করে তাহলে হীরে বিক্রি করছে তবে ওগুলো না-কাটা

মানে আন্-কাট হীরে। এ হীরে দিয়ে ওরা কি করতো কে জানে? ওরা শহর ছেড়ে চলে গেল কেন? ছবি দেখে তা বোঝা যায় না। শহরটা আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ধ্বংস হয়ে যায় নি তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কোনো কারণে শহরবাসীরাই শহর ত্যাগ করে চলে গেছে।

মানরো বললো, গোরিলারাই ওদের তাড়িয়ে দিয়েছে। তার কথা শুনে সবাই হেসে উঠলো। গোরিলা তো ওরা আসবার আগেই ছিল তাহলে ওরা এখানে শহর তৈরি করলো কি করে? গোরিলারা বাধা দেয় নি?

মানরো বললো, হেসো না, জায়গাটা মোটেই সুবিধের নয়, ভলক্যানোর উৎপাত রয়েছে, ভলক্যানো মাঝে মাঝেই আগুন বমি করে এবং সেই সময়ে জীবজন্তু অদ্ভুত আচরণ করে। কোনো এক অগ্ন্যুৎপাতের সময় গোরিলা হয়তো ক্ষেপে গিয়েছিলো, তাদের সঙ্গে এখানকার মানুষরা পেরে ওঠে নি। তোমরা জান যুদ্ধের সময় পশুরা কেমন আচরণ করে? ওই আফ্রিকাতেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যুয়র ওয়ারের সময় বেবুনরা দলে দলে দোকানপাট লুট করতো, ইথিওপিয়ায় ওরা মোটর বাস আক্রমণ করতো।

পিটার বললো, কোনো মহামারী বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় আশংকা করেও তো শহর ছেড়ে চলে গিয়ে থাকতে পারে।

আপাততঃ কোনো সন্তোষজনক সমাধান হলো না। কোনো পুরাতত্ত্ববিদ সঙ্গে থাকলে হয়তো বলতে পারতো। আলোচনা করতে করতে সন্ধ্যার আগে তারা ক্যাম্পে ফিরে এলো।

সে রাত্রিটাও নির্বিঘ্নে কেটেছিল। শক্তি বাঁচাবার জন্যে রাত্রি দশটার পর ওরা বাইরের ইনফ্রা-রেড আলো নিবিয়ে দিয়েছিলো। এই আলোর সাহায্যে ঘোর অন্ধকারেও অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যেতো।

আলো নেবার কিছুক্ষণ পরে শোনা গেল গাছের ডাল ও পাতার নড়া-চড়ার ধ্বনি। বাইরে পাহারা মোতায়েন ছিল। মানরো আর কাহেগা তাদের মেসিন গান প্রস্তুত রাখল। একটু পরে পিটার শুনতে পেলো শিস নয় কিন্তু শিসের মতোই মৃদু একটা শব্দ যা শুনলে কেমন ভয় করে। প্রথম অভিযানের যেসব ভিডিও টেপ ছিল তাতেও পিটার এই আওয়াজ

শুনেছিল। এটা কি গোরিলাদের কোনো সংকেত ? কিন্তু কিছু ঘটলো না যদি ডালপাতা নড়ার শব্দ থামলো না। তার মানে গোরিলারাও রয়েছে এবং তাদের লক্ষ্যও করছে হয়তো। তবে কিছু দেখা যাচ্ছে না।
ঘণ্টা খানেক পরে একটা ঘটনা ঘটলো। আত্মরক্ষার জন্যে ক্যাম্পের চার-দিকে বৈদ্যুতিক তার লাগানো ছিল। হঠাৎ সেই তারের এক জায়গায় জোর স্পার্ক দিলো। সারা ক্যাম্প লাল আলোয় আলোকিত হলো। কিছুই দেখা গেলো না। তবে বাকি রাত্রিটা আর কোনো গোলমাল হয় নি।

পরদিন সকালে পিটার ঘুম থেকে উঠে দেখলো সকলে আগেই উঠে পড়েছে এবং নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। ব্রেকফাস্ট খেয়ে পিটার বাইরে এলো। কাল রাত্রে কি ঘটেছে দেখা দরকার। বাইরে ইলেকট্রিক তারের বেড়ায় কেন স্পার্ক হলো সেটা দেখা দরকার।
পিটার বাইরে এসে দেখলো মানরো তার আগেই এসে তদারক আরম্ভ করে দিয়েছে। জমিতে তাজা পায়ের ছাপ, বেশ গভীর কিন্তু ছোট, প্রায় ত্রিকোণ, বুড়ো আঙুল থেকে অন্য আঙুলগুলো বেশ তফাতে, মানুষের হাতের মতো।
পিটার দেখে বললো, এ ছাপ মানুষের তো নয়ই, গোরিলারও নয় তবে বানরজাতীয় কোনো জীবের হতে পারে।
মানরো বললো, এ ছাপ গোরিলারই তবে পায়ের নয়, হাতের।
পিটার বললো গোরিলারা অপর গোরিলাকে হত্যা করে না যদিও আমি টাই-টাই-এর উদ্ধারকারী মিসেস সোয়েনসনের কাছে শুনেছিলুম যে টাই-টাই-এর মাকে অন্য একটা গোরিলা মাথা পিসে দিয়ে হত্যা করেছে, গোরিলারা মানুষকে আক্রমণ করে না, রাত্রে তো নয়ই।
তাহলে মিঃ ইলিয়ট এই ছাপগুলো যে গোরিলা বা জন্তু করেছে তাকেই তুমি প্রশ্নগুলো কোরো।

ইলেকট্রিক তার পরীক্ষা করে দেখা গেল তারের গায়ে গ্রে রঙের কিছু লোম আটকে রয়েছে। পিটার বললো, এই দেখ, গোরিলার লোমের রং গ্রে হয় না কালো হয়।

পুরুষ গোরিলার হয়, পিঠের চুল কালো নয়।

কিন্তু সাদা, এই গ্রে রঙের চেয়েও অনেক সাদা, না না মিঃ মানরো এ গোরিলা নয় তবে কাকুনডারি হতে পারে।

হিমালয়ের যেমন ইয়েতি, অ্যামেরিকার যেমন 'বিগফুট' তেমনি কাকুনডারি একটি বিতর্কিত জীব। অনেকে কাকুনডারি দেখেছে কিন্তু কেউ তাদের ধরতে পারে নি। এরা পেছেনের ছু পা দিয়ে হাঁটে, বেশ লম্বা, ছ' ফুট হবে, গা লোমে ভর্তি, বুনো মানুষ। গ্রামে ঢুকে এরা নাকি মানুষের সঙ্গে দেহ মিলন ঘটায় বলে শোনা যায়। খবরের কাগজেও এমন খবর ছাপা হয়েছে। অনেক বিজ্ঞানীও কাকুনডারির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

মানরো বললো, না মিঃ পিটার এই ছাপগুলো গোরিলার হাতের ছাপ, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। একটা বা একাধিক গোরিলা এখানে এসে-ছিলো, আরও ছাপ আছে, আমাদের তাঁবুর চারদিক ওরা ঘুরে দেখেছে। পিটারের কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। গোরিলা হতেই পারে না।

গাছের ওপর এক পাল কলোবাস মংকি কিচিমিচি দাপাদাপি শুরু করে দিল। কিছু একটা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে।

কাছেই ছিল সরু একটা স্রোতস্বিনী, দূরে ঝরনার জল সরু নদী হয়ে বয়ে আসছে আর কি। মালাবি নামে একজন কুলি জল আনতে গিয়েছিল কিন্তু ফিরতে দেরি হচ্ছিল। জল পর্যন্ত মালাবি পৌঁছতে পারে নি, তার আগেই তাকে হত্যা করা হয়েছে।

ক্যাম্প থেকে কিছু দূরে মালাবির লাশ পাওয়া গেল। সেই একই ভাবে তাকেও হত্যা করা হয়েছে। মাথাটা ছু'দিক দিয়ে চাপ দিয়ে কে যেন গুঁড়িয়ে দিয়েছে। মৃত্যুর সময় মালাবি দাঁড়িয়ে ছিল বলেই অনুমান করা হচ্ছে। তাহলে যে তাকে হত্যা করেছে সে তার চেয়েও লম্বা ছিল। মোটা টারপলিনের তৈরি শূন্য বালতিটা গড়াগড়ি খাচ্ছে।

খবর পেয়েই মানরো, পিটার ও ক্যারেন এবং কাহেগা ও কুলির দল ছুটে এল। সে এক রক্তাক্ত ও বীভৎস দৃশ্য, দেখা যায় না। মালাবির লাসের পাশে মানরো হাঁটু গেড়ে বসে যতদূর সম্ভব মাথাটা পরিষ্কার করে সে দেখতে লাগল কি করে তার মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি কোনো প্রাণী দু' হাতের চাপ দিয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে সে প্রাণী প্রচণ্ড শক্তিশালী। গোরিলারও তত শক্তি নেই এবং গোরিলা ছাড়া তাকে আর কেউ হত্যা করে নি। তাহলে গোরিলা তাকে কি করে হত্যা করলো? তারা কি সঙ্গে করে ভাইস মেসিন এনেছিল? যার ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে প্যাঁচ ঘুরিয়ে দিয়ে মাথাটা পিশে দিয়েছে? কিন্তু তা সম্ভব নয়।
ক্যারেন ও পিটারও ভাবছে কে তাকে মারল এবং কি করে?
সহসা মানরো উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠলো, পিটার তুমি কাল জিঞ্জে মসলা না শস্য পেশাই করবার যে দুটো পাথর কুড়িয়ে পেয়েছিলে সে দুটো কোথায়?
কেন? ক্যাম্পে আছে, পিটার বললো।
সে দুটো ছুটে গিয়ে নিয়ে এসো তো।
পিটার প্রথমে ভ্রূকুটি করলো কিন্তু পাথর দুটো নিয়ে এলো। পাথর দুটোর আকৃতি অনেকটা জুতোর শুকতলার মতো, বেশ মোটা ও ভারি। ধরবার জন্যে পাশে খাঁজ কাটা রয়েছে। পাথর দুটো লম্বায় প্রায় দশ ইঞ্চি হবে এবং চওড়ায় পাঁচ ইঞ্চির মতো হবে।
পিটার পাথর নিয়ে ফিরে আসবার আগে মানরো মালাবিকে ঠেস দিয়ে বসিয়েছে। পিটার পাথর আনতেই মানরো তার হাত থেকে পাথর দুটো দু'হাতে নিয়ে খাঁজে খাঁজে আঙুল বসিয়ে বেশ করে ধরে মালাবির মাথার দু'দিক থেকে সহসা প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলো। আশ্চর্য! আগে যতোটা হাড় ভেঙেছিল মানরো তার বেশি কিছু করতে পারে নি।
পাথর দুটো হাতে নিয়ে মানরো উঠে দাঁড়িয়ে ক্যারেন ও পিটারকে বললো এই দুটো পাথর হলো মার্ডার ওয়েপন। মলোবিকে যখন মারা হয় তখন মালাবি দাঁড়িয়ে ছিল। খুনী মালাবির চেয়ে লম্বা এবং অত্যন্ত শক্তি-

শালী। আমি তো মালাবিকে আঘাত করে কিছু করতে পারলুম না কিন্তু জন্তুটা একটা তাজা মানুষের মাথা গুঁড়িয়ে দিলো। এ কাজ গোরিলার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে।

পিটার কোনো জবাব দিতে পারলো না।

ইতিমধ্যে কিকিউ কুলিরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কাহেগা মানরোকে বললো, বস্ আমরা দেশে ফিরে যাবো।

সে কি কাহেগা ? আমাদের ফেলে তোমরা চলে যাবে ?

হ্যাঁ চলে যাবো। আমাদের একজন ভাই মারা গেল। কুলিরা ভয় পেয়েছে। তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আরে তা কি হয় ? এদিকে এসো। মানরো কাহেগা ও কুলিদের এক পাশে নিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করলো। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বুঝিয়ে তাদের থাকতে রাজি করালো।

পিটার যেন বোকা বনে গেছে। গোরিলা সম্বন্ধে তার যে বিদ্যা তার সঙ্গে সব মিলছে না। গোরিলাই যদি হয় তাহলে বলতে হবে এরা ভিন্ন গোষ্ঠীর গোরিলা তবে মানরো যা বলছে তা কি করে মেনে নেওয়া যায় ? গোরি-লারা কি নিজেরাই ঐ পাথর জোড়া তৈরি করেছে ?

মানরো যখন মালাবিক পাথর দিয়ে আঘাত করেছিল তখন কিছু রক্ত ছিটকে পিটারের জামা প্যান্টে লেগেছিল। পিটার সেগুলো ধোবার জন্যে জলের ধারে মানে সেই সরু নদীতে গেল। যখন সে শার্ট ধুচ্ছিলো তখন তার মনে হলো কেউ বুঝি তাকে লক্ষ্য করছে। মুখ তুলে সামনের দিকে চেয়ে দেখলো নদীর ওধারে লম্বা লম্বা ঘাসের আড়ালে বেশ বড় একটা পুরুষ গোরিলা তাকে লক্ষ্য করছে। গোরিলার দৃষ্টিতে কোনো প্রতিহিংসার ছাপ নেই। শুধু একটা কৌতূহল। পিটার জানে গোরিলাটা তাকে আক্রমণ করবে না কারণ গোরিলারা জলকে ভয় পায়, সে এ পারে আসবে না। এই সুযোগে পিটার গোরিলাটাকে দেখতে লাগলো। চুলের রং গ্রে হলেও এটা-নিশ্চিতই গোরিলা কিন্তু আরও ভালো করে দেখবার আগেই ঘাস সরিয়ে গোরিলাটা চলে গেল। কিন্তু আরও

একটা গোরিলা রয়েছে যেন ? গোরিলাটা উঠে দাঁড়ালো। এর লোম কিন্তু কালো, স্ত্রী গোরিলা। আরে এ তো টাই-টাই ! টাই-টাই উঠে দাঁড়িয়ে বললো পিটার আমার গা চুলকে দাও।

টাই-টাই।

পিটার এক লাফে সরু নদী পার হয়ে টাই-টাইকে জড়িয়ে ধরলো। টাই-টাইও। টাই-টাইকে সঙ্গে নিয়ে পিটার ক্যাম্পে ফিরে এলো। কিকিউ কুলিরা টাই-টাইকে দেখে রীতিমতো বিরক্ত। তারা বললো ওটাকে মেরে ফেলুন। ওটা গোরিলাদের দলে গিয়ে গুপ্তচরের কাজ করেছে। ওরই জন্যে আমাদের একটা ভাই মারা পড়লো। যাই হোক তাদের অনেক কষ্টে মানরো শান্ত করলো।

টাই-টাইকে পিটার জিজ্ঞাসা করলো সে চলে গিয়েছিল কেন ? উত্তরে টাই-টাই বললো নদী পার হবার আগে তার গায়ে পিন ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছিল কেন তাই সে অভিমান করে চলে গিয়েছিল। পিটার আর ভালবাসে না, টাই-টাই-এর খুব দুঃখ টাই-টাই-এর জন্যে পিটার দুধ, কলা লজেন্স কিছুই দিচ্ছে না।

গোরিলাদের খবর জানবার জন্যে পিটার ব্যস্ত। টাই-টাইকে পিটার বার বার সেই প্রশ্নই করলো আর টাই-টাই শিশুর মতো আবদার করতে লাগলো আমার দুধ কই ?

টাই-টাই দুধ না পেলে কিছুই বলবে না। তাদেরও ভুল হয়ে গেছে, সঙ্গে কিছু কনডেন্সড মিল্ক বা পাউডার মিল্ক ও লজেন্স আনা উচিত ছিল কিন্তু অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে ভুল হয়ে গেছে।

মানরো তখন সেই উৎকৃষ্ট শ্যামপেনের খানিকটা গেলাসে ঢেলে টাই-টাইকে দিলো। একটা সিগারেটও দিলো। শ্যামপেন পান করে সিগারেট টেনে টাই-টাই-এর মেজাজ ফিরে এসেছে। এবার পিটারের প্রশ্নের উত্তরে টাই-টাই বললো যে-গোরিলাদের কাছে সে গিয়েছিল তারা ভালো গোরিলা, তারা তার গা শুঁকতো, খেতে দিতো, সে তাদের সঙ্গে ঘুমতো। তাদের সেও পছন্দ করতো। কিন্তু কি খেতে দিতো সে তার নাম

জানে না। সে তাদের ভাষা বা ইসারা বুঝতে পারে নি। গোরিলারাও তার নির্বাক ভাষা বা ইসারা বুঝতে পারে নি। সে দুধ, কলা আর লজেন্সের জন্যে ফিরে এসেছে তাছাড়া সে পিটারকে ভালবাসে।

বলতে গেলে কিছুই জানা গেল না। কিন্তু এক গোষ্ঠীর গোরিলাকে আর এক গোষ্ঠীর গোরিলা দলে নিলো কি করে? এমন তো হবার কথা নয়। জঙ্গলের ঐ গোরিলাদের কি কিছু বুদ্ধি আছে? মানুষদের ক্যাম্পের খবর জানবার আশায় ওরা কি টাই-টাইকে দলে নিয়েছিল এবং টাই-টাই-এর ভাষা বুঝতে না পেরে তারা তাকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছে? আরও একটা কথা আছে। টাই-টাই মেয়ে গোরিলা এবং পরিণত। সেজন্যেই কি ওরা ওকে দলে রেখেছিল? তাহলে ফিরিয়ে দিলো কেন? টাই-টাই এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারলো না।

টাই-টাইকে পিটার এবার খুব সাবধানে প্রশ্ন করলো, টাই-টাই গোরিলারা রাত্রে আমাদের ক্যাম্পে আসতো? টাই-টাই সঠিক জবাব দিতে পারে না। পিটার ধৈর্য ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানাভাবে তাকে প্রশ্ন করতে থাকে। যেটুকু উত্তর আদায় করা গেল তা থেকে জানা গেল যে রাত্রে গোরিলারা তাঁবুতে আসে না, যারা আসে তারা দুষ্টু পশু, রাত্রে ঘুমোয় না, পরস্পরে নিশ্বেস ফেলে সংকেত করে। দুষ্টু প্রাণিগুলো গোরিলা নয়, মানুষও নয়, ওরা না-গোরিলা।

তবে কি কলের মানুষ? পিটার প্রশ্ন করে।

না, কলের মানুষ নয়, দুষ্টু পশু, এখানে আসে, টাই-টাই গুড গোরিলা, পিটারকে ভালবাসে। তাকে আর প্রশ্ন করা গেল না। সে বিরক্ত হচ্ছে, হাই তুলছে। বললো, পিটার টাই-টাই-এর গা চুলকে দাও, টাই-টাই ঘুমোবে।

জিঞ্জ শহরের বাকি বাড়ি বা ঘরগুলো দেখা যাক। এই ঘরগুলোয় ঢোকা দুঃসাধ্য। বাঁশ ও অন্যান্য গাছ জন্মে পথ রোধ করেছে। সেই সব গাছ

কেটে রাস্তা বার করতেই দুপুর হয়ে গেল কিন্তু এবার যে ঘরগুলিতে তারা পৌঁছলো সে ঘরগুলি মাটির নিচে। অনেক প্রাচীন শহরে মাটির নিচে ঘর দেখা যায়, এ শহরও তার ব্যতিক্রম নয়।

মাটির নিচে ঘরগুলি তাদের নিরাশ করলো কারণ সেই ঘরগুলিতে কিছুই পাওয়া গেল না। মানরো তো আশা করেছিল কোনো একটা ঘরে সে গুপ্তধন পাবে আর ক্যারেন আশা করেছিল কিছু মজুত ব্লু ডায়মণ্ড থাকতে পারে।

ঐ ঘরগুলির ভেতরে ওরা ওপরে ওঠবার সিঁড়ি আবিষ্কার করলো। সেই সিঁড়ি দিয়ে ওরা ওপরে একটা ঘরে পৌঁছলো। এই ঘরের দেওয়াল দেখে তারা অবাক। এই ঘরের দেওয়ালে কিন্তু শ্যাওলা জমে নি। এই ঘরের দেওয়াল অন্য পাথরের তৈরি এবং দেওয়ালে একটা হলদে রঙের কোনো পদার্থের প্রলেপ দেওয়া আছে। সেই হলদে প্রলেপের ওপর অনেক ছবি আঁকা রয়েছে।

এই ছবিগুলো দেখে জিঞ্জ শহরবাসীদের জীবনধারার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। মেয়েরা রান্না করছে, ছেলেরা বল নিয়ে খেলা করছে, কারও হাতে ছোট লাঠি, লেখকরা কাঁচা মাটির টালির ওপর লিখছে। আর একটা দেওয়ালে শিকারের ছবি, কটি বস্ত্র পরে বর্শা হাতে শিকারীরা পশু শিকার করছে।

আর একটা দেওয়ালে খনিজ বস্তু আহরণের দৃশ্য। মাটির ভেতর সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছে। শ্রমিকরা মাথায় করে ঝুড়ি ভর্তি পাথর নিয়ে সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। যদিও এখন এদিকে কুকুর দেখা গেল না কিন্তু দেওয়ালে আঁকা কয়েকটা কুকুর ও সিভেট ক্যাট বা গন্ধ গোকুল দেখা গেল। কোথাও চাকার ছবি দেখা গেল না। সম্ভবতঃ ওরা চাকার ব্যবহার শেখে নি।

মানরো একটা মন্তব্য করলো। সে বললো হীরের খনির জন্যেই এই শহরের পত্তন হয়েছিল। হীরে ফুরিয়ে গেছে শহরবাসীরাও শহর ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছে। তখন হয়তো অলংকারে ব্যবহারের উপযোগী হীরে ও অন্যান্য

রত্নও পাওয়া যেত নচেৎ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বা কাঁচকাটা হীরে নিয়ে সে যুগের মানুষ কি করবে ? ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডায়মণ্ড ব্যবহারের উপযুক্ত কোনো শিল্পের অস্তিত্ব ছিল বলে তাদের জানা নেই।

ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে তারা বেশ বড় একটা প্রাঙ্গণে এলো। প্রাঙ্গণের একধারে থামওয়ালা বারান্দা ও একটা বড় ঘর দেখা গেল। পিটার যেমন একজোড়া পাথর কুড়িয়ে পেয়েছিল এবং মানরো যাকে মার্ডার ওয়েপন বলে সন্দেহ করে সেইরকম অনেক পাথর প্রাঙ্গণে পড়ে রয়েছে।

প্রাঙ্গ ার হয়ে বারান্দায় উঠলো। বারান্দা পার হয়ে ঘরে। ঘরটা বেশ বড়, ছাদ ও অনেক উঁচুতে। যদিও ছাদ অনেক জায়গায় ভেঙে পড়েছে। ভাঙা ছাদের ভেতর দিয়ে ঘরের ভেতরে রোদ এসে পড়েছে। ঘরের মাথায় একটা কিছু কাঠামো বা মূর্তি রয়েছে যেটা বুনো একটা লতা সম্পূর্ণভাবে ঢেকে দিয়েছে।

এটা কি একটা মন্দির নাকি ? লতা গাছটাকে কেটে দেখা যাক। ক্যারেন বললো, সাবধান, ওর ভেতরে সাপ থাকতে পারে। মানরো ও পিটার দু'জনে মিলে লতা গাছটাকে কেটে ফেললো কিন্তু এই কি জিঞ্জ শহর-বাসীদের দেবতা ?

ওরা দেখলো একটা বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে পাথরের তৈরি বিরাট এক গোরিলা, গোরিলার দুই হাত প্রসারিত এবং খঞ্জনীর মতো ধরা রয়েছে দুটো সেই পাথর।

ক্যারেন বললো, এরা তাহলে গোরিলার উপাসনা করতো, গোরিলাই এদের দেবতা ছিল।

মানরো বললো, টাই-টাইকে জিজ্ঞাসা কোরো সে পশুগুলোকে গোরিলা মনে করে না কেন ? যাই হোক চলো এবার ক্যাম্পে ফেরা যাক, রাত্রের জন্যে আমাদের তৈরি হতে হবে। আমার মন বলছে আজ রাত্রে ওরা আমাদের অ্যাটাক করবে।

কাহেগা ও কুলিদের সহায়তায় মানরো ক্যাম্পের চারদিকে একটা খাল খুঁড়লো তারপর সেই সরু নদী থেকে নর্দমা খুঁড়ে খালটা জলে ভর্তি

করলো। নেহাতই সামান্য ব্যাপার। এক ফুট চওড়া এবং কয়েক ইঞ্চি গভীর।

ক্যারেন বললো এ তোমার ছেলেখেলা মানরো। মানরো বললো, এখনি পরীক্ষা করে দেখা যাক। মানরো ইসারা করে টাই-টাইকে ডাকলো, কামঅন গার্ল, আমি তোমার গা চুলকে দোব, সুড়সুড়ি দোব।

আনন্দে নাচতে নাচতে টাই-টাই মানরোর দিকে ছুটে আসতে আসতে হঠাৎ খাল দেখে থেমে গেল। সে কিছুতেই খাল পার হলো না। মানরো বললো, গোরিলারা জলকে ভয় করে, সেজন্যে ঘৃণাও করে।

মানরো তখন টাই-টাইকে কোলে তুলে নিয়ে এপারে এলো। টাই-টাই তবুও আপত্তি করেছিল। টাই-টাই-এর বুক পিঠ হাত-পা চুলকে দেবার পর কাতুকুতু দিয়ে মেজাজে ফিরিয়ে এনে মানরো ওকে ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়ে বললো, আমাদের ডিনারের পর টাই-টাইকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখবে নইলে ও যদি একা বেরিয়ে পড়ে তাহলে রাত্রে ওকে চিনতে না পেরে আমাদেরই গুলি করে দিতে পারে।

তবে টাই-টাইকে যেভাবে চেন দিয়ে বাঁধা হয়েছিল সে চেন টাই-টাই ইচ্ছে করলেই খুলতে পারবে কিন্তু তাকে কেন চেন দিয়ে বাঁধা হচ্ছে এ কথা বুঝিয়ে বলার পর টাই-টাই প্রতিজ্ঞা করলো সে চেন খুলে বাইরে যাবে না। সে ইসারায় বললো, টাই-টাই লাইক পিটার। পিটারও বললো, পিটার লাইক টাই-টাই। কোনো ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে, আমরা আবার দেশে ফিরে যাবো।

ঠিক সময়ে ডিনার শেষ হলো। মানরো ও ক্যারেন আগে তাঁবুর বাইরে এলো। টাই-টাইকে খাইয়ে ও ঘুম পাড়িয়ে পিটার বাইরে এসে দেখলো বাইরে ইনফ্রা-রেড আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। রক্ষীরা চোখে নাইট গগল্‌স পরে হাতে লাইট মেসিন গান নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে ওরা বুঝি অন্য গ্রহের জীব।

ক্যারেন লেসার বিম ট্রাইপডের ওপর কি একটা যন্ত্র বসাচ্ছিল। পিটার জিজ্ঞাসা করতে ক্যারেন বললো এ হলো লেসার ট্র্যাকিং প্রোজেক্টাইল।

সুইচ টিপলেই ঐ মেসিনগানগুলো চালু হবে। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটবে।

আর ঐ ব্ল্যাক বক্সগুলো কি জন্যে ?

ওগুলো সাউণ্ড সিস্টেম, এটা হাকামিচিরা ওদের ক্যাম্পে বসিয়েছিল, এখন সাইলেনসার লাগানো আছে কিন্তু মাথার বোতামটা আস্তে টিপে দিলেই এমন একটা আওয়াজ বেরোবে যে মনে হবে যেন কানের পর্দা ফেটে যাবে। সেই তীব্র ও হ্রস্ব তরঙ্গের আওয়াজ সহ্য করা কঠিন।

পিটারের হাতে ছিল একটা টেপ রেকর্ডার। তার মতলব গোরিলারা যদি আক্রমণ করে তাহলে সে তাদের ভাষা রেকর্ড করে নেবে। টাই-টাই বলেছে ঐ না-গোরিলাগুলো নিশ্বেস দিয়ে কথা বলে। ওদের নিশ্বেস ফেলার কায়দা আছে।

মানরো বললো, গোরিলা, না-গোরিলা বা যেই হোক আমরা তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত। এখন শুধু অপেক্ষা করছি !

ক্যাম্পের বাইরে অন্ধকার, চারদিক নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে গাছের পাতা নড়ার ও ঝরনার জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

পিটার একবার ক্যাম্পের ভেতর ঘুরে এলো। টাই-টাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে, নাক ডাকছে। বাইরে এসে সেও একটা নাইট গ্লাস চোখে লাগিয়ে নিল। একটু ভারি, তা হোক কিন্তু ক্যাম্পের বাইরে অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

এগারোটা বেজে গেল। বারোটাও বাজলো। গোরিলাদের দেখা নেই। পিটার ভাবছে টাই-টাই বলেছে যারা তাঁবু আক্রমণ করে তারা হলো না-গোরিলা, অর্থাৎ গোরিলা কিন্তু পার্থক্য আছে। সে যদি কাছ থেকে এই না-গোরিলার দেখা পায় তাহলে সে নতুন প্রজাতির গোরিলা আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করতে পারবে। বানরজাতীয় পশু গবেষণার ক্ষেত্রে তার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু বারোটা কখন বেজে গেছে তাদের তো দেখা নেই।

পিটার হাই তুললো, কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলো। রাত্রি একটা। কোথাও

কিছু নেই। মানরোর অনুমান ভুল। আজ কিছু ঘটবে না। গোরিলারা ঘুমোচ্ছে।

তারপর পুরো এক মিনিটও কাটে নি বোধহয়। পিটার সেই শব্দ শুনলো। নিশ্বাস ফেলার শব্দ। নিশ্বাস কখনও দীর্ঘ কখনও হ্রস্ব। এই শব্দ ঠিক কোন্ দিক থেকে আসছে বোঝা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে চারদিক থেকেই আসছে। পিটার তার টেপ রেকর্ডার চালু করে দিয়েছে।

মানরো, কাহেগা এবং অন্যান্য রক্ষীরাও এই আওয়াজ শুনেছিল। তারা অস্ত্র নিয়ে রেডি। অন্ধকারে দেখবার চেষ্টা করছে গোরিলারা কোন্ দিক থেকে আসছে।

মানরো যে সরু নালা কেটেছিল তার ওপরেই যেন কিছু পড়ার ও সঙ্গে সঙ্গে জলের ছপছপানির আওয়াজ পাওয়া গেল। পিটার সেইদিকে গিয়ে দেখলো নালার ওপর কাঠের একটা মোটা গুঁড়ি পড়ে রয়েছে। এই আওয়াজটাও সকলে শুনেছিল।

বেড়ার ওধারে গাছপালা নড়ছে, নিশ্বাসের আওয়াজও জোর এবং দ্রুত হচ্ছে। ওবা বোধহয় আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। মানরোকে ডেকে পিটার সেই কাঠের গুঁড়িটা দেখালো। মানরো কিন্তু আগেই দেখেছে।

মাথার ওপব গাছের ডালে কলোবাস মংকিগুলো কিচমিচ করে উঠলো। মানরো পিটারকে বললো, সাবধান। তারপর সে পিটারকে ইসারায় ট্রাইপড স্ট্যাণ্ডগুলো দেখিয়ে দিল। গোরিলারা আক্রমণ করলেই তুমি ঐ যন্ত্রটা চালু করে দেবে, তাহলে মেসিন গানও চালু হয়ে যাবে।

নিশ্বাসের আওয়াজ থেমে গেছে। গোরিলারা আক্রমণ করলো। ওরা আত্মরক্ষামূলক ইলেকট্রিক তার বা পেরিমিটার ডিফেন্স ভাঙবার চেষ্টা করছে। একযোগে কয়েকটা গোরিলা সেই চেষ্টা করছে। তারের গায়ে তাদের হাত ঠেকার সঙ্গে সঙ্গে স্পার্ক, যেন ফুলঝুরি, আর পোড়া মাংসর গন্ধ। অন্ততঃ ছ'টা গোরিলা আক্রমণ করেছে।

পিটার ট্রাইপড যন্ত্র চালু করে দিয়েছে। মেসিন গান থেকে গুলি ছুটছে।

মানরো কাহেগা এবং রক্ষীরাও মাঝে মাঝে গুলি চালাচ্ছে। কলোবাস মংকিগুলোর কিচিমিচি আর দাপাদাপি অনেক বেড়ে গেছে। কয়েকটা গাছের ডাল ক্যাম্পের ওপর স্বভাবতই ছিল কারণ ওরা গাছতলাতেই তাঁবু গেড়েছিল কিন্তু কেউ এই গাছের ডালগুলোর কথা ভাবে নি। ওরা সকলে দেখলো সেই সব গাছের ডালে কয়েকটা গোরিলা ঝুলছে। যে কোনো সময়ে নিচে লাফিয়ে পড়বে। ওরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগলো। ওদিকে পেরিমিটার ডিফেন্স বিকল হয়ে গেছে। কোথাও বোধহয় তার ছিন্ন হয়ে গেছে।

আবার নিশ্বাসের জোর আওয়াজ। ওদিকে ওপরে গাছের ডালে গোরিলা আর এদিকে জমিতে পেরিমিটার ডিফেন্স-এর ওপরে আরও গোরিলা এসেছে। অবস্থা সঙ্গীন, দারুণ সংকটজনক। বুঝি রক্ষা করা যাবে না। গুলি চালিয়ে ওদের আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না। এবার সেই শব্দযন্ত্রটা চালু করতে হবে। মানরোও পিটারকে চিৎকার করে বললো, ব্ল্যাকবক্সের বোতাম টিপে দাও, ব্যাটারা ক্যাম্পের ভেতর ঢুকে পড়লো বলে।

পিটার যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে ব্ল্যাকবক্সগুলো একটু তফাতে ছিল। পিটার বোতাম টিপে যন্ত্র চালু করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওপরে গাছের ডাল থেকে দুটো গোরিলা ঝুপ করে নিচে পড়লো। একটা মরে গেছে, বোধহয় গায়ে গুলি লেগেছিল। আর একটা মরে নি। পিটার আরও একটা ব্ল্যাকবক্স চালু করেছে, তৃতীয়টা যখন চালু করতে যাচ্ছে তখন জীবন্ত গোরিলাটা তাকে আক্রমণ করতে ছুটে আসছে। তীব্র ও কানফাটা আওয়াজে আকাশ-বাতাস বনজঙ্গল কেঁপে উঠেছে। আওয়াজ সহ্য করা যায় না।

পিটার হুমড়ি খেয়ে পড়লো। গোরিলাটা পিটারকে আক্রমণ করে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবে কিংবা হয়তো সেই জোড়া পাথর দিয়ে আঘাত করে মাথাটাই হয়তো গুঁড়িয়ে দেবে। সে সময়ে পিটারের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না, ছিল টেপ রেকর্ডার।

পিটার পড়ে গিয়ে দেখলো গোরিলাটা প্রায় সোজা হয়ে হেঁটে তার দিকে

ছুটে আসছে। ওদিকে দুটো গোরিলা পেরিমিটার ডিফেন্স ভেঙে ফেলেছে আর বুঝি রক্ষা করা যাবে না।

পিটার আক্রান্ত। গোরিলাটা পিটারের ওপর পড়লো বুঝি। মানরো ও কাহেগার দৃষ্টি এড়ালো না। তারা একযোগ গুলি করলো। কিন্তু গোরিলাটা মরলো না। তবে সেই শব্দের সুফল পাওয়া গেল। গোরিলারা এমন শব্দ কখনও শোনে নি। আর বন্দুকের আওয়াজও শোনে নি এবং বারুদের গন্ধ তারা চেনে না। তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। পিটারের আক্রমণকারী আহত গোরিলাটাই সর্বপ্রথমে পালাতে আরম্ভ করলো এবং তার দেখাদেখি আর সমস্ত গোরিলা পালাতে শুরু করলো। ক'টা গোরিলা এসেছিল বোঝা গেল না কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে ক্যাম্প ও আশপাশ ফাঁকা হয়ে গেল। মেসিন গান ও শব্দ-যন্ত্র বন্ধ করে দেওয়া হলো। সমগ্র বনাঞ্চলে নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

পরদিন সকালে দুটো গোরিলার মৃতদেহ পাওয়া গেল। দুটোই পুরুষ। দুটোই গুলিতে মরেছে। গাছের ওপর থাকতেই একটার গায়ে গুলি লেগেছিলো আর অপরটা যেটা পিটারকে আক্রমণ করতে এসে গুলি খেয়ে জখম হয়েছিলো, সেটা ক্যাম্প থেকে বেশি দূরে যেতে পারে নি। সেটাকে ক্যাম্পের ভেতর তুলে আনা হলো।

পিটার গোরিলা দুটোকে পরীক্ষা করতে শুরু করলো। দুটোরই বয়স দশ বছর হবে কিন্তু যা তাকে বিস্মিত করলো তা হলো এদের সারা দেহের গ্রে রঙের লোম। গ্রে রঙের লোমওয়ালা গোরিলা পিটার এবং কোনো গোরিলা-বিশেষজ্ঞের জানা নেই। পিটার আরও নানাভাবে পরীক্ষা করে এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলো যে সে এক ভিন্ন প্রজাতির গোরিলা আবিষ্কার করেছে। আনন্দ হবারই কথা কিন্তু সেই আনন্দ সে উপভোগ করতে পারছে না; কারণ এখনও ওরা গোরিলা রাজ্যে রয়েছে, কখন কি বিপদ ঘটে কে জানে? তার উপর মাউন্ট মুকেংকো বেসুরে গান গাইছে। এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে কি না এখনও বলা যায় না।

গোরিলা পরীক্ষা শেষ করে পিটার বললো সে কাল ঐ গোরিলাদের

নিশ্বাস-ভাষা রেকর্ড করেছে। সেই রেকর্ড বিশ্লেষণ করবার জন্যে সে টেপ বার্কলে ইউনিভারসিটিতে পাঠাতে চায়। সেখানে একজন এক্সপার্ট আছে। ক্যারেন রাজি হলো না, বললো ওটা তেমন জরুরী নয়। পিটারও তেমন চাপ দিল না। তবে টেপ রেকর্ডিং পাঠালে ওরা বোধহয় ভালো করতো।

পিটার স্থির করলো টেপ রেকর্ডিং সে সঙ্গে নিয়ে যাবে আর একটা মৃত গোরিলার পুরো কংকাল নিয়ে যাবে। আপাততঃ গোরিলার স্কেলিটন তৈরি করা যাক। ভাগ্যিস যন্ত্রপাতিগুলো সঙ্গে এনেছিলো।

দূরে কোথায় যেন বোমা ফাটল। গুম্ গুম্ আওয়াজ কানে এসে লাগলো। জেনারেল মুগুরুর গোলন্দাজরা বোধহয় গোলাবর্ষণ করছে। মানরো বললো যুদ্ধটা হচ্ছে এখান থেকে অন্ততঃ পঞ্চাশ মাইল দূরে। সে আওয়াজ এখানে পৌছাবার কথা নয় তবে কিসের আওয়াজ সে বলতে পারছে না। কাহেগার কুলিদের মুখ গম্ভীর টাই-টাইও যেন চঞ্চল। ওরা যেন কিছু আশংকা করছে। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

মানরোও চিন্তিত তবে ঐ আওয়াজের জন্যে নয়। গতরাত্রের লড়াইয়ে অর্ধেকের বেশি বুলেট শেষ হয়ে গেছে। আজ ওরা আরও বেশি সংখ্যায় নিশ্চয় আক্রমণ করবে।

পিটার যখন তাকে বললো, এই গোরিলাগুলো অন্য প্রজাতির গোরিলা, টাই-টাই ঠিকই ধরেছে, তার মতে এগুলো না-গোরিলা, ব্যাড থিং।

মানরো শুনে বললো, কোন্ জাতির কোন্ ধর্মের গোরিলা তা জেনে তার কোনো লাভ হবে না। সে জানতে চায় গোরিলারা যদি আবার আজ আক্রমণ করে তাহলে কি:ভাবে ও কোন্ দিক দিয়ে আক্রমণ করবে তাই জানতে সে অনেক বেশি আগ্রহী। কারণ গোরিলা সম্বন্ধে তুমি এতদিন আমায় যা বলেছ তার সঙ্গে কিছুই মিলছে না। তুমি বলেছিলে গোরিলারা শান্ত স্বভাবের, তারা ঝামেলা এড়াতে চায়। রাত্রে কখনও আক্রমণ করে না, মানুষকে তো নয়ই কিন্তু এরা দেখছি রাত্রেই আক্রমণ করে, দিনে ওদের দেখা নেই। ক্যারেনের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি বুলে-

টের অবস্থা কি ?

জিঞ্জ শহরের এখনও কিছু দেখতে বাকি আছে। ওরা যে অংশকে মন্দির মনে করেছিল সেটা একবার ভালো করে দেখা দরকার। ঐ ঘরের দেওয়ালেও ছবি আছে।

তাই ওরা আবার মন্দিরে ফিরে এসেছে। সেই গোরিলা স্ট্যাচুর পিছনে রয়েছে কতকগুলো ছোট ছোট খুপরি। ক্যারেন বললো, এরা তো গোরিলা ভজনা করতো, সেজন্যে কয়েকজন পুরোহিত নিযুক্ত ছিল। পুরোহিতরা এই খুপরিগুলোয় থাকতো। শহরটা ঘিরেই তো গোরিলা। গোরিলার উৎপাতে জিঞ্জবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে গোরিলা ভজনা আরম্ভ করে। গোরিলার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে ও তাদের শান্ত করবার জন্যে বলিদান পর্যন্ত দিতো। পুরোহিতরা একটা পৃথক শ্রেণী ছিল তারা এই খুপরিতে থাকতো। তাদের কাছে যাতে অন্য কোনো লোক আসতে না পারে সেজন্যে এই দেখ, এই একটা ঘর রয়েছে, এই ঘরে চৌকিদার থাকতো পুরোহিতদের কাছে কাউকে ঘেঁসতে দিতো না।

পিটার ও মানরো ক্যারেনের কথায় সায় দিলো না। মানরো বললো, সবই তো বুঝলুম কিন্তু ওরা তাহলে কি করে গোরিলাদের শাসনে রাখতো ? সেটা জানা দরকার।

পিটার বললো, এ ঘরের দেওয়ালে কি কোনো ছবি নেই ? ছবি যদি থাকে তাহলে কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

হ্যাঁ, এ ঘরের দেওয়ালেও ছবি আছে কিন্তু এ ঘরের দেওয়ালে শ্যাওলা পড়ে নি তবুও ছবিগুলো স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না। তখন ওরা ইনফ্রা-রেড কমপিউটার সিস্টেম নিয়ে এলো এবং তার সাহায্যে ছবি পরিষ্কার দেখা যেতে লাগলো ক্যামেরায় ইনফ্রা-রেড প্লেট লাগিয়ে কিছু ছবিও তুললো।

পাঠ্যপুস্তকের মতো ছবিগুলো সাজানো। প্রথম ছবিটায় রয়েছে কয়েকটা খাঁচায় কয়েকটা গোরিলা। খাঁচার কাছে লাঠি হাতে একজন কালো

মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।
পরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে গলায় দড়ি বাঁধা দুটো গোরিলা, সেই দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে একজন কালো মানুষ।
তৃতীয় ছবিটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। একজন কালো মানুষ একটা উঠোনে গোরিলাদের ট্রেনিং দিচ্ছে। উঠোনে মাঝে মাঝে কয়েকটা থাম রয়েছে। থামের মাথায় একটা করে গোল রিং বসানো রয়েছে।
শেষ ছবিটায় দেখা যাচ্ছে ঘাসের তৈরি কতকগুলো মূর্তি ঝুলছে। সেই মূর্তিগুলোকে আক্রমণ করতে গোরিলাদের শেখানো হচ্ছে। আগে যে গরাদ দেওয়া ঘরগুলোকে ওরা জেলখানা মনে করেছিল আসলে সে-গুলো তাহলে গোরিলাদের খাঁচা আর সেই উঠোনে, যেখানে ওরা প্যারা-লাল বার আর হরাইজণ্টোল বারের মতো কয়েকটা কাঠামো দেখেছিল সেটা তাহলে গোরিলাদের ট্রেনিং গ্রাউণ্ড।
পিটার মন্তব্য করলো, মাই গড! ওরা তাহলে গোরিলাদের ট্রেনিং দিতো। মানরো বললো, আমারও তাই মনে হচ্ছে। গোরিলাদের ট্রেনিং দিয়ে ওরা খনি বা মজুত ভাণ্ডারের পাহারাদার তৈরি করতো। আর এই পাহারাদাররা কখনও চুরি করবে না, কাজে ফাঁকি দেবে না।
চুটকি কেটে ক্যারেন বললো, এবং ইউনিয়ন করে ধর্মঘটও করবে না।
হাসি নয় মিস রস, আমি মিঃ হাকামিচির কাছে শুনেছি যে জাপানে অনেক কারখানায় শিম্পাজিদের ট্রেনিং দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে।
ক্যারেন বললো, তাহলে এটা মন্দির নয়। গোরিলা ট্রেনিং ইসকুল কিন্তু এসব ছবি তো পুরনো, জিঞ্জ শহর বা শহরবাসীরা আজ আর নেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যেসব গোরিলা আমাদের আক্রমণ করছে তারা ট্রেনিং প্রাপ্ত। তাদের কে ট্রেনিং দিচ্ছে? তুমি কি বলো পিটার?
বর্তমানে যে সব গোরিলা বাবা-মা আছে তারাই তাদের সন্তান সন্ততি-দের ট্রেনিং দেয়।
সেটা কি সম্ভব?
নিশ্চয় সম্ভব। বানরজাতীয় পশুদের মধ্যে এটা দেখা গেছে বিশেষ করে

শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে। গবেষকরা দেখেছেন শিম্পাঞ্জি বা বেবুনদের কোনো একটা বিদ্যা শেখালে যেমন পাথর কাটা, বাঁশ ছুলে লাঠি তৈরি করা শেখালে সে সেই বিদ্যা তার বাচ্ছাদের শেখায়। এটা অ্যামেরিকা এবং অন্য দেশে প্রমাণিত হয়েছে।

ক্যারেন প্রশ্ন করলো তাহলে তুমি বলতে চাইছো জিঞ্জ-শহরের মানুষেরা যে গোরিলাদের ট্রেনিং দিয়ে গেছে সেই সব গোরিলাদেরই বংশধররা আজও এখানে রয়েছে এবং গোরিলারা তাদের বংশধরদের সেই ট্রেনিং দিয়ে আসছে ?

হ্যাঁ আমি তাই বলতে চাইছি।

এবং এই গোরিলারা সেদিন যে পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করতে শিখেছিল সেই অস্ত্রই আজও ব্যবহার করছে।

অস্ত্র মানে স্টোন প্যাডল্ অর্থাৎ কোপাই বলতে পার। পাথরের অস্ত্র বানরজাতীয় জীবদের পক্ষে ব্যবহার করা নতুন কিছু নয়, এই আমাদের কথাই ধর না কেন ? আমরা যখন মানুষ হই নি। বন-মানুষ পর্যায়ে ছিলুম তখন তো আমরা পাথর ঘসে ঘসে অস্ত্র বানাতুম। বানরদের দেখেছ তো ? ওরা কত সহজে অনুকরণ করতে পারে।

তাহলে ধর এই যে তুমি টাই-টাইকে সাইন-ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বারা কথা বলতে শিখিয়েছ তাহলে টাই-টাইও কি তার বাচ্ছাকে ঐ সাইন-ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাবে ?

আমি তো তাই আশা করি।

যদি বেঁচে সকলে ফিরতে পারি এবং টাই-টাই-এর বাচ্ছা হয় তাহলে দেখে যেতে পারব এবং তখনই তোমার কথা বিশ্বাস করব।

বেশ তাই কোরো ক্যারেন।

কিন্তু পিটার টাই-টাই এই গোরিলাগুলোকে না-গোরিলা বলছে কেন ?

কারণ এগুলো গোরিলার মতো দেখতে হলেও খাঁটি গোরিলা নয়, এদের ব্যবহারও গোরিলার মতো নয়, স্বভাবও গোরিলার মতো নয়। জিঞ্জবাসীরা অন্য পশুর সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে অন্য এক প্রজাতির গোরিলা সৃষ্টি করেছে,

হয়তো শিম্পাঞ্জির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে হলেও আমি অবাক হব না।

ক্যারেন নিজে বিজ্ঞানী না হলে পিটারের কথা বিশ্বাস তো করতই না, অসম্ভব বলে হেসে উড়িয়ে দিত মানুষ ও বানরজাতীয় পশুদের রক্তের প্রোটিমের সঙ্গে যথেষ্ট মিল প্রমাণিত হয়েছে। মানুষের নিকটতম আত্মীয় শিম্পাঞ্জির কিডনি মানুষের দেহে সাফল্যের সঙ্গে বসানো সম্ভব হয়েছে। শিম্পাঞ্জি ও মানুষের ডিএনএ তুলনা করে পার্থক্য খুব কমই দেখা গেছে অতএব মানুষ বানরের মিলন উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবশ্য চতুর্দশ শতাব্দীর জিঞ্জবাসীর ডিএনএ-এর খবর রাখত না তাহলেও তাদের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাদের যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধি ছিল নইলে এই অরণ্যে শহর তৈরি করতে তারা পারতো না এবং বিরূপ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে তারা বাস করতেও পারতো না। তারা একদা গোরিলাদের যে ট্রেনিং দিয়ে গেছে তার ফল আমাদের আজও ভোগ করতে হচ্ছে। তারা গোরিলাদের শিখিয়ে গিয়েছিল আমাদের শহরের কাছে মানুষ ঢুকতে দিয়ো না এবং মানুষ ঢুকলে তাকে কিভাবে হত্যা করতে হবে তা তারা শিখিয়ে গিয়েছিল এবং সেই শিক্ষা গোরিলার দল আজও ভোলে নি এবং পাথরের সেই অস্ত্র তারা আজও রক্ষা করছে। ওরা যেন আজকের ডোবারম্যান কুকুর, রক্ষীর কাজ করে আসছে। ওরা আমাদের সকলকে হত্যা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মানরো হালকাভাবে হলেও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বললো। সে বললো আমার তো মনে হয় মানুষের চেয়ে বানরদের বুদ্ধি কিছু কম নয়, দেখ জীবন-যুদ্ধে যাকে বিজ্ঞানীরা বলে স্ট্রাগল ফর একজিস্টেন্স তাতে অনেক পশু হেরে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কিন্তু বানররা টিকে আছে আর ওদের প্রজাতিও কত রকম। ওরা মানুষের ভাষা কিছু শিখেছে, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনও করেছে, মানুষ তা করে নি।

তুমি ঠিক বললে না, হিন্দুদের মহাকাব্য রামায়ণ যদি পড়তে তো দেখতে যে সে যুগে মানুষ-বানরে দারুণ সহযোগিতা ছিল, পরস্পরের ভাষা জানতো। তুমি দেখো মানরো আমাদের টিকে থাকার জন্যে একদিন

বানরদের জীবনপথ বেছে নিতেহবে। এইআজই দেখ না আমরা এতসব যন্ত্রপাতি ও মারণাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও গোরিলাগুলোর কাছে হেরে যেতে বসেছি। আমরা যদি ওদের পথ বেছে নিই তাহলে হয়তো ওদের মোকাবিলা করতে পারবো।

পিটার গোরিলাদের সেই রহস্যময় নিশ্বাস ভাষার যে টেপরেকর্ড করেছিল সেই টেপ সে ইউস্টন মারফত বার্কলেতে পাঠিয়ে দিলো। বার্কলেতে একজন এক্সপার্ট আছে। সে হয়তো শব্দ শুনে সেই রহস্যময় ভাষা উদ্ধার করতে পারবে।

ইউস্টন ওদের আর পাঁচ দিন সময় দিয়ে বললো এরই মধ্যে হীরে খুঁজে বার করতে হবে। ক্যারেনও তাই ভাবছিল যে আর দুই তিন দিনের মধ্যে তাদের কাজ শেষ করতেই হবে কারণ মানরো বলেছে যে তাদের সঙ্গে যথেষ্ট খাবার থাকলেও গোরিলা বধ করবার জন্যে আর যথেষ্ট গুলি নেই, যা আছে তা বড়জোর এক রাত্তির চলতে পারে তারপর সেই তীব্র সাউণ্ড ও টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করতে হবে। টিয়ার গ্যাস গোরিলাদের কতটা কাবু করবে বলতে পারে না তবে সাউণ্ড অ্যাপারেটাস এক নাগাড়ে বেশিক্ষণ চালানো যাবে না বড়জোর পনেরো মিনিট তারপর পাঁচ মিনিট বিরতি দিতে হবে। কিন্তু সেই পাঁচ মিনিটেই তো গোরিলা তাদের একেবারে শেষকরে দিতে পারে। অবস্থা খুবই সংকটজনক।

কিন্তু লক্ষণ দেখে বলা যায় না, মানরো বললো গোরিলারা আজ অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অ্যাটাক করবে। মানরোর অনুমান সত্য হলো। সেদিন অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে গোরিলারা আক্রমণ করেছিল। গোরিলা তাড়াবার জন্যে মানরো অন্য একটা উপায় অবলম্বন করেছিল। সঙ্গে কিছু বিস্ফোরক ছিল। হীরের খনির কোনো অংশ ফাটাবার যদি দরকার হয় সেজন্যে সেগুলো আনা হয়েছিল।

গোরিলারা আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে মানরো টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে বলে দুমদাম করে বোমা ফাটাতে লাগলো। ব্যস! সেদিন এতেই কাজ হলো। গোরিলার দল ফিরে গেল। সে রাত্রে তারা আর দ্বিতীয়বার আক্রমণ

করে নি। কিন্তু ক্যারেন অর্ডার দিলো সে আর বিস্ফোরক পদার্থ দিতে পারবে না। যদিই খনি আবিষ্কৃত হয় এবং কোথাও ফাটাতে হয় তাহলে সে কোথায় আর বিস্ফোরক পাবে ?

পরদিন ভোরে ক্যাম্প এলাকার ভেতরে দু'জন কুলির মৃতদেহ পাওয়া গেল। সেদিন রাত্রি একটা পর্যন্ত মানরো ও পিটার বাইরে পাহারা দিয়েছিল। তখন পর্যন্ত গোরিলারা দ্বিতীয়বার আক্রমণ না করায় ওরা অনুমান করে-ছিল গোরিলারা আর ফিরে আসবে না। ওরা দু'জন তাই নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে গিয়েছিল। বাইরে দু'জন কুলিকে মোতায়েন রেখে গিয়েছিল।
বেশ বড় একটা গাছের বড় ডাল তাঁবুর ওপর এসে পড়েছিল। মানরো বললো গোরিলা ঐ ডাল বেয়ে এসে ঝুপ করে নেমে কুলিদের হত্যা করেছে। পিটার বললো, ডাল বেয়ে একটা বা দু'টো গোরিলা এলো না হয় কিন্তু তারা ফিরে গেল কি করে ?
কাহেগা কুলিদের শোকে মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে পেরিমিটার ডিফেন্স বেড়ার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে বোধহয় ভাবছিল গোরিলারা এলো কি করে ? এবং মানরো ও পিটারের আলোচনা সে শুনতে পেয়েছিল। কাহেগা হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো, হিয়ার ইট ইজ, এই যে এদিকে আসুন।
কাহেগার চিৎকার শুনে পিটার আর মানরো সেদিকে ছুটে গেল। কি ব্যাপার কাহেগা ? কি হয়েছে ?
এই যে এইখানে স্যার।
ওরা দেখলো বেড়ার ধারে একটা সরু বাঁশ পড়ে আছে, তারের পাতলা জালও কিছু ছিন্নভিন্ন। গোরিলা কিভাবে ঢুকেছিলো তা জানা গেল। সেই সরু বাঁশ দিয়ে একজন গোরিলা বেড়ার তারের পাতলা জাল তুলে ধরেছিল এবং ফাঁক দিয়ে এক বা একাধিক গোরিলা ভেতরে প্রবেশ করেছিল। বেরিয়ে যাবার সময় যতটা পেরেছে জাল যথাস্থানে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে।

দাঁতে দাঁত চেপে মানরো বললো, এই গোরিলাগুলোকে একদা মানুষে ট্রেনিং দিয়েছিল, দাঁড়াও ওদের জব্দ করছি, আমি এবার থেকে ওদের মানুষ মনে করে ওদের মোকাবিলা করবো।

পিটার জিজ্ঞাসা করলো, তা না হয় ভাবলে কিন্তু কিভাবে ওদের মোকাবিলা করবে?

অফেন্স ইজ দি বেস্ট ফর্ম অফ ডিফেন্স, আমরাই এবার ওদের আক্রমণ করবো, চল এখনি যাই, টাই-টাইকে সঙ্গে নোব।

গোরিলারা যেখানে বাস করে জঙ্গলের সেই অংশে টাই-টাই ওদের নিয়ে যেতে রাজি হলো। বেলা দশটা নাগাদ ওরা লাইট মেসিনগান নিয়ে গোরিলা নিধনে বেরিয়ে পড়লো।

গোরিলাদের দেখা পাবার আগেই ওরা গোরিলাদের বাসা দেখতে পেল বেশির ভাগ বাসা গাছের ডালে, জমিতেও কয়েকটা আছে। গাছেই সংখ্যা বেশি। একটা গাছে তো তিরিশটা বাসা দেখা গেল তার মানে গোরিলার সংখ্যা প্রচুর। মিনিট দশ হাঁটবার পর ওরা গোটা দশেক গ্রে রঙের গোরিলা দেখতে পেল তার মধ্যে ছটা গোরিলা মেয়ে, বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছে বা তাদের সঙ্গে খেলা করছে। চারটে পুরুষ গোরিলা কচি শাকপাতা খাচ্ছে। ওরা যে এসেছে সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই।

যে ক'টা পুরুষ গোরিলা দেখা গেল সব ক'টারই লোমের রং ধূসর একটার মাথার মাঝখানের চুল ও পিঠের চুল পেকে গেছে অর্থাৎ বুড়ো হয়েছে। ঐ চারটের মধ্যে একটা গোরিলা দেখে পিটারের খটকা লাগলো এ গোরিলাটা অন্য ক'টা গোরিলা অপেক্ষা যেন লম্বা, মুখটা যেন অন্যরকম অন্ততঃ নাকটা একেবারে থ্যাবড়া নয়, মুখে ও দেহে লোমও যেন কিছু ছোট। স্পষ্টতই এটা ভিন্ন প্রজাতির গোরিলা। টাই-টাই একেই বলেছিল না-গোরিলা।

মানরো ইসারা করতে তার সঙ্গীরা মেসিনগানের সেফটি ক্যাচ খুলে প্রস্তুত কিন্তু টাই-টাই মানরোর প্যান্টের পা ধরে টেনে সতর্ক করে দিল অর্থাৎ ও বলতে চাইলো গুলি চালিও না।

একটু দূরে একটা পাহাড়ের গায়ে টাই-টাই পিটারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, সেখানে অন্ততঃ তিরিশটা গোরিলা রয়েছে, তারই নিচে ঢালুতে আরও একদল, তারপর আরও, আরও। পিটার অনুমান করলো অন্ততঃ শ'তিনেক গোরিলা ইতস্তত বিচরণ করছে। সমস্ত অঞ্চলটাই গোরিলাতেই ভর্তি। স্ত্রী গোরিলার সংখ্যা বেশি। পুরুষ গোরিলাগুলো হয় শাকপাতা খাচ্ছে নয়তো ঘুমোচ্ছে। কালো লোমের একটাও গোরিলা নেই, সবই গ্রে রঙের এবং পুরুষ গোরিলার মধ্যে কয়েকটা দেখতে অন্যরকম, নাক বেশি চ্যাপ্টা নয়, অন্য গোরিলা অপেক্ষা লম্বা।

পিটারের সন্দেহ হলো এই ভিন্ন প্রজাতির গোরিলারাই তাদের ক্যাম্প আক্রমণ করে, নালার ওপর কাঠের গুঁড়ি ফেলে, লাঠি দিয়ে ইলেকট্রিক তারের বেড়া ভাঙে। মুখটা অনেকটা ক্রো-ম্যাগনন মানুষের মতো, পুরো মানুষের মতো নয়, তবে কাছাকাছি। ক্রো-ম্যাগনন মানুষরা মানুষের পূর্ব অবস্থা বলা যায়। পূর্বেকার নিয়েনডারথাল মানুষ অপেক্ষা ক্রো-ম্যাগনন মানুষরা অনেক সভ্য হয়েছিল। এই গোরিলাগুলোর মুখ যেন নিয়ানডারথাল এবং ক্রো-ম্যাগনন মানুষের মাঝামাঝি।

কিন্তু পিটার বিস্মিত একসঙ্গে এত গোরিলা দেখে। একসঙ্গে সর্বাপেক্ষা বেশি গোরিলা দেখা গেছে কাবারা অরণ্যে, সংখ্যায় তারা ছিল একত্রিশ। কিন্তু কোথায় একত্রিশ আর কোথায় তিনশ! একটা দলে সাধারণতঃ পনেরো ষেলোটার বেশি গোরিলা থাকে না।

আরও একটা ব্যাপার দেখে পিটার বিস্মিত হয়েছিল। প্রথমত গোরিলা-গুলো তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আক্রমণ করা দূরের কথা, একটাও গোরিলা ওদের তাড়া করলো না অথচ গোরিলারা যদিই আক্রমণ করে তো দিনে রাত্রে নয়। সে না হয় হলো কিন্তু এদের একটা ভাষা আছে। টাই-টাই ভুল বলেছিল। নিশ্বাস দিয়ে নয়, গলার অদ্ভুত আওয়াজ করেই তারা কথা বলছে সেই সঙ্গে বিশেষ ভঙ্গিমায় হাতও নাড়ছে যেন নাচের মুদ্রা রচনা করছে।

পিটার উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সে যা আবিষ্কার করলো তা সে যদি

নিজের চোখে না দেখতো, কানে না শুনতো তাহলে বিশ্বাস করতো না। অ্যামেরিকায় ফিরে বিজ্ঞান পত্রিকায় সে যে প্রবন্ধ লিখবে তা পড়ে কি প্রাণিবিদরা বিশ্বাস করবে? অবশ্য সম্ভব হলে কিছু প্রমাণ তো সঙ্গে নিয়ে যাবে। তবুও তার সন্দেহ থেকে যায়।

যদিও গোরিলাদের অক্রমণের কোনো অভিপ্রায় নেই বোঝা যাচ্ছে তথাপি এক সঙ্গে এতো গোরিলা দেখে দলের সকলে ভয় পেয়ে গেল। যদিই আক্রমণ করে তাহলে তাদের তো খুঁজেই পাওয়া যাবে না। তিনটে মেসিন গান আর কতক্ষণ ওদের সঙ্গে যুঝবে? অতএব পশ্চাদপসরণ করাই ভালো। মানরোর নির্দেশে তারা ফিরে এলো।

পিটারের ইচ্ছে সে যদি একটা মেয়ে গোরিলা ধরতে পারতো! তাহলে সে তাদের ভাষাটা আয়ত্ত করতে পারত। কিন্তু তা কি হবে?

ক্যাম্পে ফিরে এসে টাই-টাই তার সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বারা বেশ জোর দিয়ে পিটারকে বললো, এখানে আর নয়। এখনি ফিরে চল।

মানরো জিজ্ঞাসা করলো, তোমার মংকি কিছু খেতে চাইছে নাকি?

না, ও বলছে এখনি এখান থেকে চল।

ক্যারেন বললো, মাথা খারাপ, এখনও ব্লু ডায়মণ্ডের চেহারাই দেখলুম না আর অমনি ফিরে যাব? আবদার।

যে দু'জন কুলি মারা গিয়েছিল তাদের কবর দিয়ে বাকি কয়েকজন কুলি ফিরে এসে বললো তারা এখানে আর থাকতে চায় না।

মানরো ক্যারেনকে বললো, আমরা যদি এখানে মরেই যাই তাহলে তোমার ব্লু ডায়মণ্ড কি কাজে লাগবে? ঐ তো হাকামিচি সদলে মরে গেল।

আমাদের আর কোনো উপায় নেই, ফিরতেই হবে। যদি পার তো এখনই রওনা হও। কারণ আমার মনে হচ্ছে দেরি করলে আমরা আর ফিরতেই পারবো না, আজ রাত্রেই কি ঘটে কে জানে।

মানরোই যখন বেঁকে বসলো তখন আর উপায় নেই। পিটার ও ক্যারে-

নের সন্দেহ হলো ওরা যেতে রাজি না হলে মানরো তার দলবল নিয়ে একাই ফিরে যাবে।

সবই প্রায় পড়ে রইল, যতদূর সম্ভব কম জিনিস সঙ্গে নিয়ে ওরা যাত্রা আরম্ভ করলো। মানরো আগে চলেছে, তার পিছনে লাইন করে বাকি আর সব। আবার সেই রেনফরেস্টের ভেতর দিয়ে যাত্রা কিন্তু পথটা ভিন্ন মনে হচ্ছে। গাছপালাগুলোও অন্য রকম। ছোটবড় অনেক রকম ফার্ন ও ট্রি-ফার্নের গভীর জঙ্গল। চলতে চলতে ওরা অনুভব করলো ঐ ফার্ন গাছের জঙ্গলের মধ্যে গোরিলার দল লুকিয়ে রয়েছে। ওরা তাদের লক্ষ্য করছে। বড় গাছও রয়েছে। কি সুন্দর অর্কিড ফুল ঝুলছে।

মানরো বললো, মাউণ্ট মুকেংকোর পুব গায়ে পৌঁছতে পারলে আমরা নিরাপদ। তার আগে আমরা জিঞ্জ পার হবো, জিঞ্জ পার হলে গোরিলারা আমাদের আর বাধা দেবে না।

ওরা বেশি দূর যায় নি। এতক্ষণ ওরা গোরিলাদের অস্তিত্ব অনুভব করছিল কিন্তু ফার্ন গাছের পাতা নড়তে লাগল। গোরিলাদের অস্তিত্ব ভালো করেই টের পাওয়া গেল এবং তারপর শোনা গেল সেই সি-সি-সি হিস্-হিস্-হিস্ শব্দ। বাতাস নেই। যত তারা এগিয়ে যায় আওয়াজও তত জোর হয়।

ওরা একটা সংকীর্ণ গিরিখাতের ভেতর এসে পড়েছে। দু'ধারের পাহাড় বেশি উঁচু নয়। পাহাড়ের গায়ে বেশি গাছপালাও নেই। এখানে বোধহয় কোনোকালে একটা নদীর স্রোত বইতো এখন নদী নেই তাই শুকনো। পায়ের নিচে পাথর।

এখানে যদি গোরিলার দল ওদের আক্রমণ করে? ওদের সেইরকম সন্দেহ হলো। গোরিলাদের সংখ্যাও বেড়েছে, ওদের অস্থিরতাও বেড়েছে। শি-শি-শি আওয়াজ যেন আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে।

কাহেগা জিজ্ঞাসা করলো, কি করবো বস্। গুলি চালাব? গ্রেনেড ছুঁড়বো?

খবরদার ও কাজ কোরো না। চল আমরা ফিরে যাই। ওরা আবার

ক্যাম্পের দিকে পা বাড়ালো।

ক্যারেন খুশি। সে বললো, এই জায়গাটায় আসবার পর গোরিলারা এত চঞ্চল এবং আমাদের আক্রমণ করতে উদ্যত হলো কেন? এই জায়গায় হীরে আছে, একটু দেখবো?

মানরো উৎসাহ দিল না, বললো অন্য সময়ে দেখা যাবে, এখন কিছুতেই নয়!

ফিরতে ফিরতে পিটার বললো, একটা গোরিলা ধরা যায় না মানরো? টাই-টাইয়ের সাহায্যে আমি ওদের ভাষাটা আয়ত্ত করতে চাই। কাল লক্ষ্য কর নি আমাদের সাউণ্ড বক্স থেকে যে ধরনের আওয়াজ বার করছিলুম তাই শুনে ওরা ফিরে গেল? ওদের ভাষার সঙ্গে সেই শব্দের কোনো মিল আছে যা শুনে ওরা রিট্রিট করেছিল। আমি ইঞ্জেকশন রেডি রাখছি, দেখ না একটা গোরিলা যদি একা পাও, দলছুট হয়ে গেছে, মেয়ে গোরিলা, সঙ্গে বাচ্চা নেই এমন একটা।

যদিও বা ধরতে পারি তাহলে তাকে কি করে কায়দা করবে?

আমরা তাকে ভালো করে খাওয়াবো। টাই-টাইকে বলবো ওকে দলে টানবার চেষ্টা কর। আগে তো ধরি তারপর দেখা যাবে।

থোরালেন ইঞ্জেকশন ভরা সূচ নিয়ে পিটার রেডি হয়ে রইল, শিকার পেলেই সে তার পিস্তল থেকে থোরালেন তীর ছুঁড়বে। ওরা এগিয়ে চলে, কোমর পর্যন্ত ফার্ন বা অন্যগাছের ঝোপ। ওরা ফিরে যাচ্ছে দেখে গোরিলারাও ধীরে সুস্থে ফিরে যাচ্ছে। মানরোর ইচ্ছে কোনো এক সময়ে ওদের ধোঁকা দিয়ে সরে পড়বে। কি করে ওদের ধোঁকা দেওয়া যায় সেই চিন্তাই সে করছে।

পিটার চারদিকে চোখ রাখতে রাখতে এগিয়ে চলেছে, যদি কোথাও একটা মেয়ে গোরিলা একা দেখতে পায়। দেখতে পেয়েছে। সে যেমন আশা করেছিল ঠিক সেইরকম, একটা দলছুট গোরিলা একটা ঢালু জায়গার ধারে কি একটা গাছের কচিপাতা তুলে খাচ্ছে। দলের আর সবাই এগিয়ে গেছে।

পিটার যতটা সম্ভব কাছে গিয়ে তাক করে ইঞ্জেকশনের সূচ ছোঁড়বার পিস্তলের ট্রিগার টিপেছো। আর ট্রিগার টেপার সঙ্গে সঙ্গে সে পা পিছলে গড়িয়ে প্রায় কুড়ি ফুট নিচে পড়ে গেছে। কয়েকটা পুরুষ গ্রে গোরিলা পিটারকে এইভাবে পড়তে দেখে তার কাছে এসে তাকে ঘিরে ধরেছে। পিটার মড়ার মতো পড়ে আছে। তিনটে গোরিলা তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কিন্তু একটাও তাকে স্পর্শ করে নি। ওরা নিজেদের মধ্যে কি পরামর্শ করছে আর মাঝে মাঝে মুখে হো হো আওয়াজ করছে। পিটার বুঝলো গোরিলাগুলো তা ক্ষতি করবে না। সে সাহস করে কনু-ইয়ে ভর দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা গোরিলা মুখে কি রকম একটা আওয়াজ করে ডান হাত দিয়ে মাটি চাপড়াতে লাগল। পিটার বুঝলো ওকে আবার শুতে বলছে। পিটার শুয়ে পড়তেই গোরি-লারা শান্ত হলো।

টাই-টাই ইসারা করে মানরোকে কি বললো। মানরো বুঝতে না পেরে তার হাতের মেসিনগান তুলতেই টাই-টাই জোরে ওর হাঁটুতে কামড় বসিয়ে দিলো। মানরো নিরস্ত্র হলো। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

পিটারও দেখলো যে চুপ করে পড়ে থাকা ছাড়া তার আর অন্য কোনো উপায় নেই। প্রথমে গোরিলাদের গায়ের গন্ধ তার অসহ্য মনে হচ্ছিল কিন্তু একটু পরে তার নাক বোঁদা হয়ে গেল। গোরিলাগুলো তাকে এত-ক্ষণে মেরে ফেলতে পারত বা তার কোনো ক্ষতি করতে পারতো কিন্তু তা তারা করে নি। এদিকে সে প্রচুর ঘামছে। জামা প্যান্ট ভিজে গেছে। এদের মতলব কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

একটা না-গোরিলাও দলে ছিল। হঠাৎ সেই গোরিলাটা কতকগুলো ঘাস ছিঁড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে বুক চাপাড়াতে লাগলো। পিটার ভাবল তার শেষ মুহূর্ত আসন্ন।

টাই-টাই একটা কাণ্ড করে বসলো। সে কোথাও ছিল সেখান থেকে ছুটে এসে পিটারের পায়ের কাছে বসে বড় না-গোরিলার দিকে চেয়ে তার সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে বললো, তোমরা চলে যাও, পিটার ভালো মানুষ লোক।

কিন্তু ওরা ওর কথা বুঝলো না। টাই-টাই তখন ওদের অনুকরণে গলায় শি-শি-শি আওয়াজ করতে লাগল। তাও বোধহয় তারা বুঝল না।
টাই-টাই তখন পিটারকে নিজের সন্তানের মতো আদর করতে লাগল। এবার কাজ হলো। গোরিলারা নিজেদের মধ্যে কি শলা পরামর্শ করে বনের মধ্যে নিজেদের আড্ডার দিকে ফিরে গেল। ওরা বোধহয় মনে করলো পিটার টাই-টাই-এর সন্তান।
যে যাই মনে করুক টাই-টাই সে যাত্রা পিটারকে বাঁচিয়ে দিল। পিটার যে মেয়ে গোরিলাটাকে লক্ষ্য করে ইঞ্জেকশনের সূঁচ ছুঁড়েছিল সেই সূঁচ গোরিলার গায়ে লাগে নি। পিটারের আর গোরিলা ধরা হলো না। যাক সে প্রাণে বেঁচে গেল।
বেলা দু'টো নাগাদ সকল ক্যাম্পে ফিরে এল। ক্ষিধে তেষ্টায় সকলে কাতর। যাইহোক ওরা যে যা পারল খেল। একটু সুস্থ হয়ে ক্যারেন ইউস্টনে আরিটেসা হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করলো কিন্তু বৃথা। কিছুতেই যোগাযোগ করা গেল না।
কি হলো ক্যারেন ? এখন তো হাকামিচি নেই, জ্যাম করবার কেউ নেই, তাহলে ?
ক্যারেন বললো, এটা জ্যামিং-এর ব্যাপার নয়, সূর্যের জন্যে আয়ানো-স্ফিয়ারে কোনো গোলমাল হয়েছে। সাধারণতঃ এরকম গোলমাল কয়েক ঘণ্টা বা বড়জোর এক দিন স্থায়ী হয় কিন্তু এবার মনে হচ্ছে সাত দিনের আগে অ্যাটমোস্ফিয়ার ক্লিয়ার হবে না।
এই প্রথম তারা অনুভব করলো বাইরের সভ্য জগৎ থেকে ওরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ইউস্টনও ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না।
পিটার নিজের মনেই ভাবছে না-গোরিলাদের ভাষার কিছু অংশও সে যদি ধরতে পারে তাহলে সে তাদের সাউণ্ড বক্সে ওদের ভাষার অনুকরণ করে ওদের ভয় পাইয়ে দেবে।
টাই-টাইকে একটু তোয়াজ করে দেখা যাক। টাই-টাই একবারে চুপ করে বসেছিল। পিটার তাকে কাছে ডেকে তার মাথা চুলকে দিতে

লাগলো, গায়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগলো। এসব টাই-টাই-এর খুব ভালো লাগে। সে মেজাজে থাকে। সে তার নির্বাক ভাষায় বললো, টাই-টাই গুড গোরিলা, পিটার গুড হিউমান ম্যান, টাই-টাই ভালো গোরিলা, পিটারও ভালো মানুষ। পিটার দেখলো টাই-টাই মেজাজে আছে। সুযোগ বুঝে সে জিজ্ঞাসা করলো।

টাই-টাই তুমি কি না-গোরিলার কথা বোঝো না ?

টাই-টাই বললো, না-গোরিলা কথা বলে না, গলায় আওয়াজ করে।

কি রকম আওয়াজ করে টাই-টাই ?

না-গোরিলাদের আওয়াজ টাই-টাই অনুকরণ করে কিছু শোনালো। অদ্ভুত আওয়াজ, কখনও মনে হয় সিস্ দিচ্ছে, কখনও মনে হয় নিশ্বাস নিচ্ছে আবাব কখনও স্পষ্ট কোনো আওয়াজ করছে শি-শি-শি হিস্-হিস্, শুঁ-শুঁ-শুঁ, হো-হো-হো-হো। এই সঙ্গে টাই-টাই মাঝে মাঝে হাত দিয়ে ইসারাও করতে থাকে।

টাই-টাই ওদেব সব ভাষা বুঝতে না পাবলেও কিছু বুঝতে পারছে। ওদেব সঙ্গে আরও কিছুদিন থাকলে হয়তো শিখে ফেলত। টাই-টাই যতটা শিখেছে তাই থেকে পিটাব যতটা পারল নিজে শেখবাব চেষ্টা কবলো। তারপর টাই-টাই-এর সেই সব শব্দ কমপিউটারে ফেলে তা থেকে অনেক অর্থ উদ্ধার করলো।

এবপব সে ঠিক কবলো এই শব্দগুলি সে টেপ করে নেবে তারপর টাই-টাইকে নিয়ে বনে গোরিলাদের আড্ডায় যাবে, সঙ্গে টেপ বেকর্ডার নেবে। বনের গোরিলা বা না-গোরিলাদের শব্দ-ভাষা রেকর্ড কবে আনবে। গোরিলারা রাত্রে আক্রমণ করলে অ্যামপ্লিফায়াব মারফত সেই শব্দ জোরে বাজাবে। দেখা যাক গোরিলার দলকে ধোঁকা দেওয়া যায় কি না।

টাই-টাইকে কিছু খাইয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে চললো পিটার গোরিলাদের আড্ডায়। দিনের আলো এখনও ঘণ্টা দুই থাকবে।

গোরিলাদের আড্ডায় গিয়ে পিটার পাতার আড়ালে মাইক্রোফোন

ঝুলিয়ে দিয়ে টেপ রেকর্ডার চালু করে অপেক্ষা করতে লাগলো। কোনো সাড়া শব্দ নেই। তবুও পিটার অপেক্ষা করে। মাঝে মাঝে নিজের ডিজিটাল ক্লকের দিকে চেয়ে দেখে।

কুড়ি মিনিট পার হলো। টাই-টাই সহসা পিটারের গা ঘেঁসে বসলো। পিটার বুঝলো গোরিলার দল আসছে। প্রথমে হুমহুম আওয়াজ শুনলো। তারপর অন্য আওয়াজ।

টাই-টাই ওরা কি বলছে?

তোমরা চলে যাও, বিপদ, বিপদ হবে।

তাই বলছে বুঝি কি বিপদ? পিটার জিজ্ঞাসা করে।

টাই-টাই বাড়ি যাবে, বিপদ, টাই-টাই বাড়ি যাবে। এইরকম ইসারা করতে করতে টাই-টাই পিটারের হাত ধরে টানতে লাগলো। এই সময় দূরে একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। মেঘ ডাকার নয়, মুগুরুর গোলন্দাজদের কামানের আওয়াজও নয়, তবে মাউন্ট মুকেংকো জেগে উঠেছে।

ক্যাম্পে ফিরে পিটার দেখলো মানবো গোরিলাদের আক্রমণের মোকাবিলার আয়োজন করছে। ক্যাম্পের ওপর গাছের যে কয়েকটা ডাল ঝুলছিল সে কয়েকটা কেটে দিয়েছে। নালাটা আরও চওড়া করেছে, ট্রাইপড স্ট্যাণ্ডের ওপর লেসার বিমের সাহায্যে যে অটোম্যাটিক মেসিনগান চলে সেগুলিকে যথাযথ বসিয়েছে। এখন সে ক্যাম্পের চারপাশে পেরিমিটার ডিফেন্স অয়ার মেরামত করে ক্যারেনের সহায়তায় তার বৈদ্যুতিক শক্তির তীব্রতা যতটা সম্ভব বাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। স্টকে তখনও এক শিশি অরেঞ্জ মার্মালেড ছিল। পিটার সেই শিশিটি টাই-টাইকে উপহার দিয়ে সাউণ্ড বক্স নিয়ে বসলো। ক্যারেন জিজ্ঞাসা করলো, কি পিটার নতুন ধরনের কোনো আওয়াজ সৃষ্টির চেষ্টা করছো নাকি?

ঠিক তা নয়, আমি চেষ্টা করছি গোরিলাদের অস্ত্র দিয়েই ওদের তাড়াতে। ওদের অস্ত্র তো দু'হাতে দুটো পাথরের কোপাই?

তা নয়, ওদের কিছু ভাষা রেকর্ড করে এনেছি, দেখি সেই ভাষা জোরে বাজিয়ে ওদের ফিরিয়ে দেওয় যায় কি না। কিন্তু পিটার তুমি কি মাউণ্ট মুকেংকোর দিকে একবার চেয়ে দেখেছ ?

একবার কেন ? বারবার চেয়ে দেখছি, মনে হচ্ছে যে কোনো সময়ে ইরাপসান আরম্ভ হবে।

গোরিলার আক্রমণ থেকে আমরা যদি বেঁচেও যাই তাহলেও মাউণ্ট মুকেংকোর হাত থেকে আমাদের বাঁচবার আশা নেই।

ক্যারেনের কথার পিটার কোনো জবাব দিলো না। সে তখন গোরিলাদের ভাষার সেই অংশটুকু "তোমরা চলে যাও, বিপদ" পৃথক করে নিয়ে বারবার বাজাবার চেষ্টা করলো। তার আগে ও পরে কানে না শোনা যায় অথচ তীব্র প্রতিক্রিয়া হতে পারে এমন কিছু না-শোনা সনিক শব্দ তরঙ্গ। তার স্থির বিশ্বাস অস্ত্রের সাহায্যে না হলেও সে তার সাউণ্ড বক্সের সাহায্যে না-গোরিলাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে। তবে তার একটা আফশোস থেকে যাবে। একটা না-গোরিলা সে সঙ্গে নিয়ে ফিরতে পারবে না।

ফিরতে যে পারবে না সে কথাটা কাহেগা মানরোকে মনে করিয়ে দিলো, বললো বস্ আমরা না হয় গোরিলাদের হাত থেকে বাঁচলুম কিন্তু মুকেংকো তো যে কোনো মুহূর্তে ফেটে পড়বে মনে হচ্ছে। তার হাত থেকে বাঁচবো কি করে আর বাঁচলেও ফিরব কি করে ?

মানরো বললো, আগে তো বেঁচে উঠি তারপর ফেরার চিন্তা, বিপদ কেটে গেলে আর বেঁচে থাকলে ফিরতে ঠিকই পারবো। ও চিন্তা এখন মুলতুবি রেখে গোরিলাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখ।

ট্রাইপডের ওপর মানরো লেসার গানগুলো ঠিক করে রাখল। অন্ধকার নেমে এসেছে, ইনফ্রা-রেড লাইটগুলো জ্বেলে দেওয়া হলো। মানরো, কাহেগা আর দু তিন জন কুলি চোখে নাইটগ্ল্যাস পরে নিয়েছে। মানরোর চিন্তা লেসারগানের রসদ বেশি নেই, মেসিন গানের অবস্থাও তথৈবচ,

খোলা জায়গায় টিয়ার গ্যাস বেশি কার্যকরী হচ্ছে না তার ওপর আগ্নেয়-গিরির মুখ থেকে গন্ধক ও অন্যান্য গ্যাসও গন্ধ ছড়াচ্ছে, বিস্ফোরক পদার্থ বেশি নেই, যাও বা আছে ক্যারেন তা খরচ করতে দেবে না তবে কিছু হ্যাণ্ড গ্রেনেড আছে। ভরসা, পিটার যদি শব্দ-তরঙ্গ দ্বারা কিছু করতে পারে। শেষ অস্ত্র হিসেবে আছে দুটি ধারালো কুঠার। একটি নেবে মানরো অপরটি কাহেগা।

সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত কোনো দিক থেকে গোরিলা নড়াচড়ার কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। শব্দ যা শোনা যাচ্ছিল তা মাউন্ট মুকেংকোর এবং গাছের পাতার। মাউন্ট মুকেংকো থেকে এখনও আগুন বেরোয় নি তাহলে অন্ধকারের পরও চারদিক আলোকিত হতো। যা বেরোচ্ছে তা কিছু গলিত পদার্থ, লাভা নয়, সেই পদার্থ অন্য দিকে বয়ে যাচ্ছে।

এক সময়ে অন্ধকার নেমে এসেছে। চারদিক ঘোর অন্ধকার। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘ ডাকছে। মেঘও চাপ চাপ। বৃষ্টি নামে তো মুষলধারেই নামবে এবং সহজে থামবে বলে মনে হয় না। বৃষ্টির প্রতিক্রিয়া কি হবে তাও বলা যাচ্ছে না। গোরিলার দল কি পালিয়ে যাবে? ওদের সব যন্ত্র-পাতি কি বিকল হয়ে যাবে?

লাল ইনফ্রা-রেড আলো ও নাইট গ্ল্যাসের দৃষ্টি বেশি দূর যায় না। যতদূর যায় তাতে অরণ্যের গভীরতা ভেদ করে গোরিলা দেখা যাচ্ছে না তবে সেই রহস্যময় শব্দ-ভাষা শোনা যাচ্ছে। গোরিলারা বোধহয় পরামর্শ করছে। পিটার মানরো ও ক্যারেন কান পেতে সেই শব্দ শুনতে লাগল। এলোমেলো শব্দ নয়। শব্দগুলো কোনো একরকম ভাষা। কি বলতে চাইছে···

একটা দীর্ঘদেহী না-গোরিলা দু'পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসছে। পিটার দেখে বললো সাব-ম্যান, প্রায় মানুষের মতো, আধা-মানুষ আর কি!

না-গোরিলটা বোধহয় দলের স্কাউট বা গুপ্তচর, তদারক করতে এসেছে। মানরো সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালিয়েছে, না-গোরিলাটা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু

করে চকিতে অন্ধকার জঙ্গলে কোথায় মিলিয়ে গেল।

তারপর আরম্ভ হলো সেই শব্দ শি-শি-শি হিস-হিস-হিস। সকলের গা শির-শির করে উঠল। না-গোরিলা বাহিনীর আক্রমণের পূর্বাভাষ। সকলে যে যার স্থানে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শব্দ শোনা যাচ্ছে সব দিক থেকে। আক্রমণটা কোন্ দিক দিয়ে আসবে বোঝা যাচ্ছে না।

এ ক'দিনই ওরা ব্যর্থ হয়েছে। এমন ব্যর্থ ওরা কখনও হয় নি। প্রথম আক্রমণেই ওরা সফল হয়েছে। আজ বোধহয় ওরা চূড়ান্ত আক্রমণ করবে অথচ এরাও আজ প্রথম তিন দিন অপেক্ষা অনেক দুর্বল। এরাও লড়বে জীবন পণ করে। কিন্তু অন্ততঃ তিনশ' গোরিলার বিরুদ্ধে ওরা মাত্র ছ'সাত জন কতক্ষণ লড়বে ?

মানরো ভরসা দিয়ে বলে, কুছ পারোয়া নেহি হ্যায়, ওরা তো মানুষ নয়, বুদ্ধিতে ওরা আমাদের সঙ্গে পারবে না। কি বুদ্ধি যে মানরো খাটাবে তা কেউ জানে না।

সময় যেন আর কাটছে না। উত্তেজনায় সকলে থর থর করে কাঁপছে। ক্যাম্পের ভেতরে কম্বলের মধ্যে টাই-টাই চুপ করে পড়ে আছে। সে খুব ভয় পেয়েছে।

ক্যারেন ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলো, ওদের কি হলো ?

উপযুক্ত সময়ের জন্যে বোধহয় অপেক্ষা করছে, মানরো বললো।

আরও কয়েক সেকেণ্ড কাটল। সকলকে চমকে দিয়ে কোথাও প্রচণ্ড জোরে একটা বাজ পড়লো। তারপর বেশ জোরে মেঘ ডাকতে লাগলো। এই বুঝি বৃষ্টি নামলো। শন শন করে জোরে প্রায় ঝড়ের বেগে হাওয়া বইতে লাগল এবং অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামল। এ বৃষ্টি বুঝি আর থামবে না।

ক্যাম্পের যাবতীয় যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে গেল। শর্ট সার্কিট হয়ে পেরিমিটার ডিফেন্স অয়ার বিকল হলো, ইনফ্রা-রেড বালবগুলি ফেটে গেল, টেপরেকর্ডের লেসার বিম সব অচল। ক্যাম্পের ভেতর বাইরে কর্দমাক্ত। এ বৃষ্টি বুঝি আর থামবে না।

গোরিলাদের মোকাবিলা করতে এখন সম্বল লাইট মেসিনগান, মানরো ও কাহেগার কোমরে গোঁজা দুটি ধারালো কুড়ুল আর পিটারের সাউণ্ড বক্স, তাতেও কিছু জল পড়েছিল তবুও পিটার জল মুছে সেটি প্লাস্টিক শীট দিয়ে মুড়ে রেখেছে।

কিন্তু ঝড়, বৃষ্টি ও মেঘ ডাকার শব্দর প্রভাবে সাউণ্ডবক্স থেকে নির্গত শব্দ কতটা কার্যকরী হবে কে জানে। আশ্চর্য যে একমাত্র টাই-টাই ছাড়া আর কেউ ভয় পায় নি। সে গুঁড়িসুঁড়ি মেরে ক্যাম্পের ভেতরে চুপ করে শুয়ে আছে। এমন বৃষ্টি সে কখনও দেখে নি এমন কি পিটার বা ক্যারেনও না। তাঁবুর বাইরে জায়গায় জায়গায় জল জমে গেছে। ক্যারেন বললো, গোরিলারা তো জলকে ভয় পায় তারা কি এই বৃষ্টিতে আক্রমণ করবে ? ঐ দেখ ক্যারেন ওরা দল বেঁধে তেড়ে আসছে। এরা গোরিলা নয় না-গোরিলা জলকে বোধহয় ভয় পায় না। আমরা মানুষ, কঙ্গোয় কেন এসেছি অথবা খাদ্যের জন্যও ওরা আমাদের আক্রমণ করছে না, ওদের শেখানো হয়েছে মানুষ মারতে। ওদের সীমানায় কোনো মানুষ এলে তাকে যেন জীবন্ত অবস্থায় ফিরে যেতে দেওয়া না হয়। নাও প্রস্তুত হও। পিটার, কাহেগা, ফায়ার।

গোরিলারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রবেগে আক্রমণ করে তাঁবু তচনচ করে দিলো। হাতের কাছে যা পাচ্ছে ভেঙ্গে তচনচ করছে।

পিটার, কাহেগা, মানরো এবং কুলিদের লাইট মেসিনগান গর্জে উঠছে। বৃষ্টির জন্যে স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না তবুও গোরিলা মরছে। লেসার বিম চালিত মেসিনগান কাজ করছে না।

পিটারের মেসিনগানের গুলি শেষ। ক্যাম্পের ভেতর ঢুকে সে অন্ধকারে সাউণ্ডবক্স খুঁজে বেড়াচ্ছে। একটা কুলি মারা পড়ল। পিটার ও কাহে-গারও গুলি শেষ। ওরা তখন কুঠার চালাচ্ছে। কুঠারের সঙ্গে গোরিলারা পেরে উঠছে না। যদি বৃষ্টি না হতো তাহলে গোরিলারা এতক্ষণে কাজ সেরে চলে যেত।

সহসা আকাশ আলোকিত হয়ে উঠল। পায়ের তলার মাটিও বুঝি মৃদু

কাঁপছে। মাউন্ট মুকেংকোর মাথা ভেদ করে লকলক করে অগ্নিশিখা বেরোতে আরম্ভ করলো। সেই আলোয় পিটার তার সাউণ্ডবক্স খুঁজে বার করে বোতাম টিপে দিয়েছে। কিন্তু কোনো শব্দই বেরোচ্ছে না। পিটার ভাবল, আর বেশিক্ষণ নয়, এই তাদের শেষ, মৃত্যু তাদের অনিবার্য। তাঁবুর ভেতর একটা গোরিলা ঢুকে পড়েছে। এইবার বুঝি কোপাই দিয়ে তাকে আঘাত করবে।

মানরো, ক্যারেন, বলে পিটার সভয়ে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু অঘটন আজও ঘটে। সাউণ্ডবক্স সেই মুহূর্তে সরব হয়ে উঠল। গোরিলাটা সহসা নিশ্চল হয়ে গেল। বৃষ্টিও সহসা থেমে গেল। মাউন্ট মুকেংকোর বুক চিরে গুম গুম আওয়াজ বেরোচ্ছে, মাটি কাঁপছে।

গোরিলার দল যে যেখানে ছিল সেইখানে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর সকলে এসে একজায়গায় জমায়েত হয়ে ফিরে চললো তাদের বনের দিকে।

মাউন্ট মুকেংকো বোধহয় এখনি ফেটে পড়বে। গোরিলারা কি সেই ভয়ে চলে গেল ? নাকি পিটারের সাউণ্ডবক্স থেকে নির্গত সতর্ক বাণী শুনে ? এর জবাব কে দেবে ?

মিনিট কুড়ি বিশ্রাম নিয়ে সকলে যখন তাঁবু ঠিক করতে আরম্ভ করলো তখন আবার মুষলধারে বৃষ্টি নামলো।

গোরিলারা কেন ফিরে গেল ? ক্যারেন মানরোকে জিজ্ঞাসা করলো। মানরো বললো, প্রাণীরা প্রাকৃতিক কোনো বিপর্যয় আগেই টের পায়, গোরিলারা বোধহয় মুকেংকোর এমন কোনো আওয়াজ শুনেছে যাতে ওরা বুঝেছে যে মুকেংকো শিগগির ফেটে পড়বে।

মুকেংকো থেকে তখন চাপ চাপ কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে, মাঝে মাঝে লকলকে আগুনের শিখা।

তাহলে তো আমাদেরও এখনি পালাতে হয়, ক্যারেন বললো, কিন্তু এই কাদাজলের মধ্যে দিয়ে যাব কি করে ?

যেতেই হবে, আমরা সব গুছিয়ে নিয়ে বেরোতে বেরোতে ভোরের আলো

ফুটবে।

টাই-টাই তাঁবুর বাইরে এসে পিটারের জামা ধরে টানতে টানতে কি বলতে চাইলো। পিটার জিজ্ঞাসা করলো, কি বলছিস টাই-টাই ?

নোজহেয়ারকে বলো এখনি এখান থেকে চলে যেতে, ব্যাড আর্থ, টাই-টাই আর থাকবে না।

মানরোকে এই কথা বলতে মানরো বললো সে যাবার ব্যবস্থা করছে। কিন্তু ক্যারেন ও পিটারের অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করার ইচ্ছে দেখা গেল না। পিটারের ইচ্ছে সে একটা মৃত গোরিলা সঙ্গে নিয়ে যাবে। গুলি ও কুঠারের আঘাতে ছ'টা না-গোরিলা মারা পড়েছে। নিজেরা কি করে ফিরবে সে বিষয়ে স্থিরতা নেই তো পুরো একটা গোরিলার লাশ নিয়ে কি করে ফিরবে ? তাহলে অন্ততঃ একটা মাথা কেটে নিয়ে যাবে। ওদের সঙ্গে পচন-নিবারক ওষুধ আছে। তা প্রয়োগ করে মাথা অবিকৃত রাখা যাবে।

ক্যারেনের চিন্তা জীবন বিপন্ন করে এত পরিশ্রম, এত অর্থব্যয় ও বিঘ্ন বিপদ তুচ্ছ করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেও টাইপ টু-বি-এর ব্লু ডায়মণ্ডের নমুনা সঙ্গে না নিয়ে ফিরলে জনসাধারণ তাদের কথা বিশ্বাসই করবে না। অতএব কপালে যাই থাক জিঞ্জ শহরে ওরা আর একবার ঢুকবেই।

পিটার ও ক্যারেন দু'জনে কমপিউটার কনসোল নিয়ে বসে অনেক হিসেবনিকেশ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে বারো ঘণ্টার আগে মুকেং-কো বিস্ফোরিত হবে না। তার মধ্যে গোরিলার মাথা কেটে, ব্লু ডায়ম-ণ্ডের নমুনা নিয়ে ওদের নিরাপদ দূরত্বে পালাতে হবে।

ভোর না হতেই ওরা জিঞ্জ শহরে এসে গেল। ব্লু ডায়মণ্ডের জন্যে মান-রোরও লোভ ছিল। সে জানে এই হীরে প্রচুর দামে বিক্রি হয়। কিন্তু এই হীরের সাহায্যে ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যতীত আরও একটি সাংঘাতিক কাজ যে করা যেতে পারে সে খবর ক্যারেন ছাড়া কেউ জানে না। সেই জন্যে নীল হীরে সংগ্রহে ক্যারেনের এত বেশি আগ্রহ।

গত রাত্রের ঝড়বৃষ্টিতে ভাঙা শহরের কয়েকটা বাড়ি একেবারে ভেঙে গেছে। রাস্তা নামে যা ছিল তাও ভেঙেচুরে গেছে। অনেকগুলো গাছ পড়ে গেছে।

জিঞ্জ শহরে যাত্রা করবার পূর্বে ক্যারেন ইউস্টনে আরিটেসা-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে মুকেংকোর অবস্থা জানাল। আরিটেসা কিছুক্ষণ পরে জানাল তোমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এস কারণ এরপর আগ্নেয়-গিরি থেকে নির্গত ধুলোর চাপে ও কার্বন মনোক্সাইডের প্রভাবে তোমরা মারা পড়বে। এই ভয়েই গোরিলারা পালিয়েছে। হারি আপ।

শহরে পৌঁছে শহরের অবস্থা দেখে ওরা যেন আশার আলো দেখতে পেল। ক্যারেন বললো, ঐ দেখ ওখানে একটা মস্ত বড় গাছ সমূলে উৎপাটিত হয়ে অনেক মাটি পাথর বেরিয়ে গেছে। বিরাট একটা গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে। ঐ জায়গাটা আগে দেখা যাক।

এ ব্যাপারে পিটারের আগ্রহ নেই। সে কান পেতে মুকেংকোর আওয়াজ শুনতে লাগল। টাই-টাই তাকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে বসে রইল।

মাঝে মাঝে মাটি কাঁপছে টাই-টাই পিটারকে জড়িয়ে ধরছে।

হাতে একটা ছোট শাবল নিয়ে ক্যারেন আর একটা ম্যাচেট, মানে একরকমের ছোরা নিয়ে মানরো মাটি পাথরের টুকরো খোঁচাতে লাগলো। বেশি হীরে পাওয়া গেল না। ক্যারেন পেল প্রায় সাড়ে সাতশত ক্যারাট আর মানরো হাজার ক্যারাটের কাছাকাছি। তবে শোষণ করে শেষ পর্যন্ত কতটুকু আসল টাইপ টু-বি ব্লু ডায়মণ্ড পাওয়া যাবে কে জানে?

ক্যারেন প্রস্তাব করলো, মানরো তুমি ঐ ডায়মণ্ড নিয়ে কি করবে? আং-টিও করতে পারবে না, টাইপিনেও লাগাতে পারবে না তারচেয়ে আমা-দের বেচে দাও আমরা তোমাকে ভালো দাম দেব।

মানরো বললো সে নাইরোবি পৌঁছে আমস্টার্ডামের হীরের বাজারের দর যাচাই করে তবে বলবে। কিন্তু আমরা এখানে আর অপেক্ষা করতে পারি না। আমরা যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থাতেই স্থান ত্যাগ করা উচিত নচেৎ সবাই মরবো। দেখছ না মাটির নিচে যেন গুড়গুড় আওয়াজ

শোনা যাচ্ছে।

পিটার বললো, আমরা এই বিপদসংকুল পথে কতদূরই বা যেতে পারব ?

মানরো বললো, চেষ্টা তো করতেই হবে। হাকামিচিদের প্লেনটা এখনও বোধহয় পড়ে আছে। দু'ঘণ্টা সময় পেলে সেখানে পৌঁছতে পারব। দেখতে হবে সেই প্লেনে যেসব যন্ত্রপাতি বা সাজসরঞ্জাম আছে তা থেকে কোনো সাহায্য পেতে পারি কি না। আমার অনুমান একটা কোলাপসিবিল চপার মানে হেলিকপটার পেতে পারি। আমরা বোকা তাই ফেরবার কোনো ব্যবস্থা করি নি।

ওরা সত্যিই তখনই যাত্রা আরম্ভ করলো। সঙ্গে যা নিলেই নয় সেইটুকু নিল। গ্রেনেডগুলো অক্ষত ছিল। মানরো সেগুলো নিতে ভুললো না আর কাহেগার কাছে ছিল দুটো পিস্তল ও কিছু কার্তুজ। এগুলো তারা বর্জন করতে পারল না।

পথ চলতে চলতে ক্যারেনকে পিটার জিজ্ঞাসা করলো, তুমি যে হীরে সংগ্রহ করলে তা কি সত্যিই জরুরী এর আর কোনো বিকল্প নেই ?

বিকল্প আছে কি না এখনও পর্যন্ত জানি না তবে পাঁচশ' বছর আগে জিঞ্জ-বাসীরা এই হীরে নিয়ে কি করত সে এক রহস্য রয়ে গেল তবে তারা নিশ্চয় অনুমান করতে পারে নি যে পাঁচশ' বছর পরে এই কঠিন ধাতুর চাহিদা যে কোনো ধাতু অপেক্ষা সবচেয়ে বেশি হবে। ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্যে ব্লু ডায়মণ্ড হবে অপরিহার্য।

ইউরেনিয়ম অপেক্ষা এর চাহিদা বেশি হবে ? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে পিটার।

ক্যারেন বললো, আমরা যাকে বলছি নিউক্লিয়ার-এজ সেই এজ আর থাকবে না। পৃথিবীতে বিপর্যয় আনবে। কেন পিটার তুমি কি শুধু জুও-লজিক্যাল সায়েন্টিফিক জার্নাল ছাড়া আর কিছুই পড় না ? এমন কি পপুলার পত্রিকা যেমন সায়েন্স ডাইজেস্ট, সায়েন্স নিউজ বা সায়েন্স ইলাস্ট্রেটেড-এর পাতাগুলোও উলটে পড় না ?

তুমি কি বলতে চাইছ ?

তাহলে শোনো। আমরা হিরোশিমার ওপর প্রথম যে অ্যাটম বোমা ফাটিয়েছিলুম তাতে যে ইউরেনিয়ম ব্যবহৃত হয়েছিল তা আমরা এই কঙ্গো থেকে সংগ্রহ করেছিলুম আর আমি যে টাইপের ব্লু ডায়মণ্ড নিয়ে যাচ্ছি পরীক্ষার পর তা যদি খাঁটি বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তার সাহায্যে এমন দ্রুতগামী রকেট তৈরি করা যাবে যার গতি হবে আলোর গতির সমান এবং রাশিয়া অ্যাটম বা হাইড্রোজেন বোমা নিক্ষেপ করবার জন্যে রেডি করবার আগেই আমরা রাশিয়ার লক্ষ্যবস্তু নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারব। রাশিয়াও জানে এমন অস্ত্র তৈরি করা যায় এবং সে কাজ আরম্ভ করেও দিয়েছে। আমরাও কাজ আরম্ভ করেছি, গোপনে নাম রেখেছি প্রজেক্ট ভালকান। কঙ্গো নিয়ে রাজনীতির দাবাখেলা চলছে। রাশিয়া কঙ্গো দখলের চেষ্টায় আছে, অ্যামেরিকাও পিছিয়ে নেই।

তুমি এসব বলছ কি? পিটার উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

এই আস্তে, মানরো শুনতে পাবে। আমি তো মানরোকে খুন করে হীরেটা দখল করবার চেষ্টায় আছি। এই হীরের গুরুত্ব মানরো জানে না। আমরা যদি আর একটু সময় পেতুম তো জিঞ্জে এক্সপ্লোসিভ ফাটিয়ে দেখতুম, তবে আমি আবার ফিরে আসব। গোরিলাদের তাড়াবার জন্যে এবার পয়জন গ্যাস আনব।

ওরা বোধহয় ঘণ্টাখানেক হেঁটেছে। হঠাৎ শুরু হলো প্রচণ্ড ভূমিকম্প। ওরা সবাই মাটিতে পড়ে গেল। মাত্র আট সেকেণ্ড, তাতেই বিপর্যয় ঘটে গেল। জিঞ্জ শহর মাটির তলায় চাপা পড়ে গেল। তার কোনো অস্তিত্বই রইল না। জীবন বিপন্ন করে একটা বড় গাছের ওপর কাহেগা দূরবীন লাগিয়ে চারদিকে দেখে এই দুঃসংবাদ নিয়ে এলো।

দুপুরে ওরা একটা ঝরনার কাছে পৌঁছল। সকলে এমন কি ক্যারেন পর্যন্ত উলঙ্গ হয়ে স্নান করে কিছু খেয়ে আবার যাত্রা আরম্ভ করল। আরও এক ঘণ্টা হেঁটে ওরা হাকামিচির প্লেন দেখতে পেল। পিটারকে টাই-টাই ইসারা করলো, নো গো ম্যান দেয়ার। যেওনা, ওখানে মানুষ আছে। মানুষ? মানরো প্রথমে অবাক হলো। তারপর নিজেই উত্তর খুঁজে পেল।

নিশ্চয় কিগানিরা। সব লুটপাট করে নিল নাকি ?
মানরো সকলকে সতর্ক করে দিলো। সাবধান, টাই-টাই ঠিক অনুমান করেছে, প্লেনটার ভেতরে ও বাইরে কিগানিরা আছে। ওরা বোধহয় লুট-পাট করছে, সকলে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়।
টাই-টাই ও মানরো ঠিকই অনুমান করেছিল। গাছের আড়াল থেকে ওরা দেখলো দু'জন কিগানি দুটো প্যাকিংকেস নিয়ে বেরিয়ে আসছে। ওরা কোনোরকমে প্লেনের গা বা জানালা কেটে ভেতরে ঢোকবার রাস্তা করে নিয়েছে কারণ প্লেনটা পড়েছিল নাক গুঁজে সেজন্যে পিছন দিকে মাল তোলবার দরজাটা উঁচুতে উঠে গিয়েছিল।
লোক দুটো বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মানরোর রিভলভার গর্জে উঠলো পর পর দু'বার। দুটো লোকই সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়লো। একটা সোর-গোল শোনা গেল। মানরো বললো আরও লোক আছে, ওরা এখনি বিষাক্ত তীর ছুঁড়বে, চল আমরা সবাই প্লেনের ভেতর ঢুকে পড়ি। কাহেগা তোমার রিভলভারটা পিটারকে দাও আর তুমি গ্রেনেড ছুঁড়বে।
ওরা সকলে সবে প্লেনের ভেতরে ঢুকেছে আর হৈ হৈ করে দশ বারো জন কিগানি প্লেনের দিকে ছুটে আসছে। পাল্লার মধ্যে আসতেই পিটার আর মানরো দুজনেই রিভলভার থেকে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করলো আর কাহেগা দাঁতে কেটে গ্রেনেড ছুঁড়তে আরম্ভ করলো। কতজন মরলো জানা গেল না তবে যারা বাকি ছিল তারা পালালো।
মানরো বললো এখান থেকে আমাদের তাড়াতাড়ি পালাতে হবে নইলে কিগানিরা দলবল নিয়ে ফিরে এসে প্লেনে আগুন লাগিয়ে দেবে। এসো আমরা দেখি পথের কিছু সম্বল পাই কি না কারণ দু'দিন আরও হাঁটতে হবে তবে আমরা জেনারেল মুগুরুর একটা ঘাঁটি পেতে পারি অবিশ্যি তার আগে মাউন্ট মুকেংকো বা কিগানিরা আমাদের মেরে না ফেলে।
পিটার জিজ্ঞাসা করলো ; কিগানিদের সেই গ্রামটা কোন্ দিকে গেল ? চল না আমরা আপাতত সেখানে আশ্রয় নিই।

আমরা তো সে পথে আসি নি পিটার।

ক্যারেন কিন্তু কথা না বলে দু'জন কুলিকে নিয়ে প্লেনের মালপত্র দেখতে আরম্ভ করেছে। প্লেন ভেঙে পড়ায় সবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। পাইলট বা রেডিও অপারেটর বা অন্য কোনো মানুষের লাশ পাওয়া গেল না। মানরো বললো কিগানিরা তাদের খেয়ে ফেলেছে।

সর্বনাশ! তাহলে তারাও যদি ধরা পড়ে!

পিটার প্রস্তাব করলো, ক্যারেন তুমি একবার ইউস্টনের সঙ্গে যোগাযোগ কর।

ক্যারেন বললো, করবো, আগে প্লেনটা আমি সার্চ করে নিই, আমাদের হাতে সময় নেই, মানরোর মতো আমিও কিগানিদের আক্রমণ আশংকা করছি, ওরা যদি আমাদের অবরোধ করেও রাখে তাহলে আমরা না খেয়ে মরবো।

বেশ তাহলে দেখ তুমি যদি তোমার ট্রান্সমিটার মারফত সভ্যজগতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো।

মানরো বললো, সেও তো বিপদ আছে, আমরা তো বেআইনী ভাবে ভিরুঙ্গার জঙ্গলে ঢুকেছি।

ওদিকে ইউস্টন কিনহাসা অবজারভেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পেরেছে যে মাউণ্ট মুকেংকোর ইরাপশান অর্থাৎ অগ্ন্যুৎগার আরম্ভ হয়ে গেছে। অবস্থা শীঘ্রই আরও খারাপ হবে।

ক্যারেন কিন্তু কারও কথা শুনছে না। সে পাগলের মতো মালপত্তরগুলো খুঁজছে। সে বলছে, হাকামিচিকে আমি চিনতুম, সে অত্যন্ত ধূর্ত, সে নিশ্চয় একটা কোলাপসিবল হেলিকপটার এনেছে। সেটা সবাই মিলে খুঁজে বার কর। তাছাড়া রাইফেলও পাওয়া যেতে পারে। এগুলি আমার হাতে এলে তবে আমি ইউস্টনের সঙ্গে যোগাযোগ করবো কিন্তু যোগাযোগ করবোই বা কি করে? আকাশের অবস্থা দেখছ না, আমাদের আলট্রাশর্ট ওয়েভ মুকেংকোর ধোঁয়া আর গ্যাস ভেদ করে যেতেই পারবে না। আমরা হেল্পলেস, কাহেগা, দেখতো ঐ ক্যানটা কি? হ্যাঁ, সোজা

কর, লেখাটা পড়ে দেখি, না না, ওটা কিছু নয়। ওগুলো সরাও, আরে এই সিলিণ্ডারগুলোতে কি আছে?

ক্যারেন হাসিতে ফেটে পড়ল। সবাই অবাক। এই বিপদে ক্যারেনের হাসির কারণ কি? সে পাগল হয়ে গেল নাকি?

হাসির ধমক থামতে ক্যারেন বললো, ঐ সিলিণ্ডারগুলোতে প্রোপেন গ্যাস আছে। হাকামিচির রান্নার জন্য নিশ্চয় এত গ্যাস সঙ্গে নেয় নি, খুঁজে দেখ নিশ্চয় একটা বেলুন আছে। ইস্ বেলুনের কথাটা আমাদের মাথায় আসে নি।

বেলুনের জন্যে বেশি খুঁজতে হলো না। ওরা বেলুন ও প্রপেন গ্যাসের সিলিণ্ডারগুলো নিয়ে প্লেন থেকে বেরিয়ে এলো। কিন্তু এখানে তো বেলুনে গ্যাস ভর্তি করলেও আকাশে ওঠা যাবে না। মাথার ওপর বড় বড় গাছ।

নদী এখান থেকে কাছে। চলো নদীর ধারে যাই, সেখানে ফাঁকা জায়গা পাওয়া যাবে। নদীর ধারে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে ওরা বেলুনে গ্যাস ভরে ঝোলানো দড়ির সিঁড়ি দিয়ে যখন একে একে ওপরে উঠেছে সেই সময়ে হৈ হৈ করে বেশ বড় এক দল কিগানি তীর আর বর্শা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটে আসছে এখানে আরো বেশি কিগানিদের দেহে সবুজ রং লাগানো রয়েছে যাতে ওরা জঙ্গলের গাছের সঙ্গে নিজেদের লুকিয়ে রাখতে পারে কিন্তু শুধু একজনের দেহে সবুজের ওপর লাল ডোরা কাটা রয়েছে।

মানরো বললো ঐ লাল ডোরা হচ্ছে ওদের লিডার। ওটাকে মারলে সবাই পালাবে। কিগানিরা পাল্লার মধ্যে আসতে না আসতে ওরা প্রায় সবাই বেলুনে উঠে পড়েছে। মানরো ছিল সিঁড়ির শেষ ধাপে। অব্যর্থ তার লক্ষ্য। তার রিভলভার গর্জে উঠলো। লাল ডোরার মাথা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল। নেতা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিগানির দল থেমে গেল তারপর তারা হঠাৎ পিছন ফিরে পালাতে আরম্ভ করলো।

হু'হাজার ফুট ওপরে ওঠার পর পুব হাওয়া ওদের কেনিয়ার দিকে নিয়ে

চললো। মাউন্ট মুকেংকো তখন ফেটে পড়েছে। অতি অল্পের জন্যে ওরা বেঁচে গেল নইলে ছাই চাপা পড়ে ও কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসের প্রভাবে ওরা মারা পড়ত।

কিন্তু হায়! কিগানিদের একটা বিষাক্ত তীর মানরোর বাহুতে বিঁধেছিল। বেলুনে উঠে সে অজ্ঞান হয়ে গেল এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে মারা গেল। কিছুই করা গেল না।

অ্যামেরিকায় ফিরে কিছুদিন পরে ক্যারেন আরিটেসার চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিয়ে-থা করে অন্য অধ্যাপনার চাকরি নিয়েছিল।

টাই-টাই ক্রমশ পূর্ণতা প্রাপ্ত হলো। তাকে নিয়ে আর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যায় না। তাছাড়া এবার তার একজন পুরুষ সঙ্গী দরকার। তখন তাকে কঙ্গোর বুকামা ন্যাশানাল ফরেস্টে ছেড়ে দেওয়া হলো। গোরিলা নিয়ে গবেষণা করবার জন্য পিটার ইলিয়টও বুকামা ন্যাশানাল ফরেস্টে চাকরি নিলো। না-গোরিলা অর্থাৎ নতুন প্রজাতির গোরিলা আবিষ্কার করে সে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছিল।

মানরো এবং ক্যারেনের কাছ থেকে প্রায় সত্তর গ্রাম খাঁটি টাইপ টু-বি ব্লু ডায়মণ্ড পাওয়া গিয়েছিল। সেই হীরে আরিটেসার কাছ থেকে প্রচুর দামে পেন্টাগন কিনে নিয়েছিল। তারা আলোর গতি সম্পন্ন মিসাইল তৈরি করেছে কিনা সেখবর গোপন আছে। তবে একটা খবর জানা গেছে টাই-টাই এর একটা বাচ্ছা হয়েছিলো। পিটারকে সে বাচ্ছা দেখিয়ে ইসারায় বলে গেল টাই-টাই লাইক পিটার।